সুধার প্রেম

সুধার প্রেম

শ্রীঅমলা দেবী



রঞ্জন পাব্‌লিশিং হাউস
২৫।২ মোহনবাগান রো
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—আশ্বিন ১৩৪৭

পুনর্মুদ্রণ—আষাঢ় ১৩৫২

মূল্য দেড় টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস

২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে

শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

১১—২৫. ৬. ৪৫

রায় সাহেব ঘনশ্যাম মিত্র কেঁচো খুঁড়িতে খুঁড়িতে একটি সাপ বাহির করিলেন। ঘনশ্যামবাবু ব্যবসায়ে উকিল। পরের কেঁচোকে সাপ বানাইয়া শুধু যে এতদিন এতবড় সংসারের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিয়াছেন, তাহা নহে ; পৈতৃক একতলা বাড়ির উপর দোতলা তুলিয়াছেন, জমিদারি ফাঁদিয়াছেন, ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স বাড়াইয়াছেন এবং রায় সাহেব হইয়াছেন। কাজেই নিজের সুরক্ষিত সংসারে এক বিষধর সর্পের আবির্ভাব দেখিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন।

ব্যাপারটা এই, একমাত্র পুত্র মনোজকুমার কলিকাতায় মেসে থাকিয়া এম. এ. ও ল পড়ে। ছেলে দেখিতে ও শুনিতে ভালই। বি. এ.-তে ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীর অনার্স পাইয়াছে। আশা করিতেছেন, এম. এ. ও ল ভাল করিয়া পাস করিতে পারিলে মুরুব্বীদের ধরিয়া মুন্সেফিতে বসাইবেন এবং কোন এক ধনী পিতার একমাত্র তনয়ার সহিত বিবাহ দিয়া এতদিন যাহা খরচ করিয়াছেন, সুদে ও আসলে সমস্ত ঘরে ঢুকাইবেন। ভগবান সুরাহাও করিয়াছেন। বৎসরখানেক হইল, এক ধনী মক্কেলের শাঁসালো এস্টেটের ভার তাঁহার হাতে আসিয়াছে। মক্কেলের নাম মৃত্যু[illegible] ঘোষ। কণ্ট্রাক্টরি করিয়া মানভূম অঞ্চলে জমিদারি কিনিয়াছিলেন, কি[illegible] সব বিলি-ব্যবস্থা করিয়া গুছাইয়া বসিতে না বসিতে পরলোকের [illegible] আসিল। কাজেই পত্নী সুরবালা, কন্যা মাধুরী ও জনকয়েক [illegible]

বিস্তর ইয়ার-বন্ধুকে একসঙ্গে বেওয়ারিস করিয়া ইহলোক হইতে বিদায় লইতে হইল। প্রজারা সুযোগ বুঝিয়া মাথা চাড়া দিয়া উঠিল, প্রতিবেশী জমিদার জমিদারির সীমানা লইয়া বিরোধ বাধাইল এবং ম্যানেজার ও গোমস্তারা বিধবাকে পথে বসাইবার জন্য গোপনে শত্রুপক্ষে যোগ দিল; তাহার উপর পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল—দুই কুল হইতেই আত্মীয়স্বজনের দল হৈ-হৈ করিয়া আসিয়া হাজির হইয়া সুরবালাকে ঘিরিয়া সমুদ্রমন্থন শুরু করিল। সুরবালা কি করিবেন, স্থির করিতে না পারিয়া ঘনশ্যাম-বাবুর শরণাপন্ন হইলেন।

ঘনশ্যাম আসিয়াই সমস্ত সেরেস্তা ঢালিয়া সাজিলেন। নিজের এক বেকার শ্যালককে ম্যানেজারের গদিতে বসাইলেন। নায়েব ও গোমস্তাদের মধ্যে যাহারা আত্মসমর্পণ করিল, তাহাদের বহাল রাখিলেন, কিন্তু যাহারা তিলমাত্র টালমাটাল করিল, তাহাদের বিদায় দিয়া নূতন লোক নিযুক্ত করিলেন। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য দীর্ঘ দেহ ও লম্বা লাঠি-ধারী পশ্চিমা পালোয়ান আমদানি করিলেন এবং সদরে মামলার পর মামলা রুজু করিয়া ছোট বড় সকল শত্রুকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিলেন। দেখিতে দেখিতে সমস্ত জমিদারিতে শান্তি ও শৃঙ্খলা মূর্তিমতী হইয়া উঠিল। প্রতিপক্ষ জমিদার সন্ধির প্রস্তাব করিল; প্রজারা যথাসম্ভব ভেট ও নজরানা দিয়া আনুগত্য জ্ঞাপন করিল, এবং বেদখল প্রজার দল দখল পাইবার জন্য ঘনশ্যামের দরবারে আনোগোনা শুরু করিল। কাঁদি কাঁদি কাঁচা কলা, বস্তা বস্তা সরু চাল, ভাঁড় ভাঁড় গাওয়া ঘি ও বড় বড় রুইমাছ কাছারিতে ও উদ্বৃত্ত থাকিলে অন্দর-মহলে পৌঁছিতে লাগিল। এমন কি ঘনশ্যামের কাছে ঘায়েল হইয়া দুই-চারিজন প্রজা অন্দর-মহলে সুরবালার কাছে আপীল করিতে লাগিল। স্বামীর জীবদ্দশায় এ সৌভাগ্য সুরবালার কোন দিন হয় নাই; অতএব ঘনশ্যামের প্রতি তাঁহার

কৃতজ্ঞতার সীমা রহিল না। বয়স কম হইলে কি করিতেন বলা যায় না, কিন্তু সম্প্রতি চল্লিশ বৎসর বয়স ও চর্ব্বিবহুল দেহ দর্পণের ভিতর হইতে পুনঃ পুনঃ দন্তবিকাশ করিয়া তাঁহাকে সামলাইয়া দিল। অতএব ঘনশ্যামের ঋণ কি করিয়া শোধ করিতে হইবে, সেই বিষয়ে পরামর্শ করিবার জন্য নূতন ম্যানেজার শৈলজাবাবুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

শৈলজাকে দেখিলে জমিদারি-সেরেস্তার ম্যানেজার বলিয়া মনে হয় না। নাদুস-নুদুস নন্দদুলাল প্যাটার্নের দেহ, ফর্সা গায়ের রঙ, ফোলা ফোলা গালের মধ্যে মোটা ও চ্যাপ্টা নাক, মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া চুলে মেয়েদের মত পরিপাটী সিঁথি। পরিধানে হাফহাতা টুইলের শার্ট, নরুন-পাড় ধুতি ও পায়ে অ্যাল্‌বার্ট স্লিপার। শৈলজার বুদ্ধি নাই বটে, কিন্তু ব্যবহারে এমনই একটি সহজ ও সরস সারল্য আছে, যাহাতে যে কোন বয়সের স্ত্রী ও পুরুষের অন্তরঙ্গ হইতে তাহার দেরি হয় না। যতদিন বেকার বসিয়া ছিল, গ্রামের ছেলেদের সর্দ্দারি করিত, থিয়েটারে ফিমেল পার্ট করিত (অবশ্য অত্যন্ত মোটা হইয়া উঠিবার পর পারিয়া উঠিত না), স্বামী ও স্ত্রীদের কলহে মধ্যস্থতা করিত, মেয়েদের হুকুম তামিল করিত, এমন কি বর্ণপরিচয়হীন নব বিবাহিত ও বিবাহিতাদের প্রেমপত্র লিখিয়া দিত। এমনই ভাবে আরামে দিন কাটিতেছিল, হঠাৎ শ্যালক-পত্নীর কড়া তাগাদার ফলে ও সুযোগ হাতের কাছে আসায় ঘনশ্যাম তাহাকে মৃত মৃত্যুঞ্জয়ের জমিদারিতে ম্যানেজার-পদে বহাল করিয়া দিলেন। ম্যানেজারির কাজকর্ম্ম আয়ত্ত করিতে শৈলজার দেরি হইতে লাগিল বটে, কিন্তু সুরবালার মন আয়ত্ত করিতে তাহার দেরি হইল না। প্রথমে সুরবালা তাহার সহিত যথারীতি পর্দ্দার অন্তরাল হইতে কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার মেয়েলী কণ্ঠস্বর, ছেলেমানুষের মত হাসি ও কথাবার্ত্তার ধরন দেখিয়া পর্দ্দা বর্জ্জন করিলেন এবং শৈলজা তাঁহার

'দিদি' বলিয়া সম্বোধন করার পর হইতে তাহাকে নাম ধরিয়া ডাকিতে শুরু করিলেন।

সুরবালাকে দেখিয়াই শৈলজা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল ও দুই হাত দিয়া দুই পায়ের ধূলা মাথায় লইল। সুরবালা বাধা না দিয়া কহিলেন, থাক থাক, দিন দুবেলা প্রণাম করতে হয় না।

শৈলজা কহিল, বলেন কি দিদি! আপনার দয়ায় ক'রে খাচ্চি।—বলিয়া দুই হাত বুকের উপর রাখিল। সুরবালা সন্তোষের হাসি হাসিয়া কহিলেন, কি যে বলে! স্নেহের সহিত কহিলেন, পাগল!

দুই চোখ কপালে তুলিয়া শৈলজা কহিল, পাগল! বলেন কি দিদি! তা হ'লে তো দেশসুদ্ধ সবাই পাগল। সব কি বলছে শুনুন-গে দিকি।

সুরবালা কৌতূহলের সহিত কহিলেন, কি বলছে?

বলছে, মা আমাদের সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা।

সুরবালা কোপের ভান করিয়া কহিলেন, হ্যাঁ, অন্নপূর্ণা না ঢেঁকি! কেউ কিছু বলে না, সব তোমার বানানো।

বানানো? বেশ।—বলিয়া শৈলজা গাল ফুলাইয়া চুপ করিয়া রহিল।

সুরবালা অন্য কথা পাড়িলেন। কহিলেন, ঘনশ্যামবাবুর সম্বন্ধে কি করা যায় বল দেখি? উনি যা করেছেন, তা শোধ দেওয়া অবশ্য অসম্ভব, তবু তো কিছু ওঁকে দিতে হবে।

শৈলজা কহিল, পাগল হয়েছেন দিদি! উনি কিচ্ছু নেবেন না। বন্ধু বন্ধুর জন্যে করেছেন।

বিস্ময়ের সহিত সুরবালা কহিলেন, বন্ধু! আমাদের কাজকর্ম [illegible]তেন শুনি, ওঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল ব'লে তো শুনি নি

শৈলজা চোখ বুজিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, শুধু বন্ধু নয়। দুই চোখ ডাগর করিয়া কহিল, একেবারে হরিহরাত্মা, মৃত্যুর খবর শুনে সাত দিন বিছানা ছেড়ে ওঠেন নি। দিদির তো হাউহাউ ক'রে কান্না।

তোমার দিদিও ওঁকে জানতেন নাকি?

জানতেন বইকি। প্রায়ই যেতেন যে। ভারি ভালবাসতেন দিদিকে। বউদিদি বলতে অজ্ঞান। ঢোক গিলিয়া কহিল, আর আমাকেও ঠিক নিজের শালার মত স্নেহ করতেন।

সুরবালা অন্যমনস্কভাবে কহিলেন, তাই নাকি? ভাবিলেন, বাইরে সকলের সঙ্গে কত ভাব, কত ভালবাসা; কিন্তু ঘরে? একটি দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া কহিলেন, কিন্তু আমার তো একটা কর্ত্তব্য আছে। কিছু ওঁকে না দিলে আমার মন স্থির হবে না।

শৈলজা কহিল, কিছুতেই উনি নেবেন না দিদি। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, ওঁর কিসের অভাব? মাসে প্রায় দু হাজার টাকা আয়—

সুরবালা দুই চোখ ডাগর করিয়া কহিলেন, দু হাজার টাকা! খুব বড় উকিল তা হ'লে?

ঘাড় নাড়িয়া শৈলজা কহিল, সকলের সেরা উকিল। খেতে নাইতে সময় পান না। একটু থামিয়া কহিল, তার ওপর ছেলে হাকিম হ'লে তো কথাই নেই।

বিস্ময়ের সহিত সুরবালা কহিলেন, কার ছেলে?

কেন? ওঁর বড় ছেলে, মনোজ। রূপে কার্ত্তিক, বিদ্যেয় বেরস্পতি বরাবর ফার্স্ট হচ্ছে আর জলপানি পাচ্ছে। সোনার মেডেলের এত[illegible] একটা মালা হয়ে গেছে।—বলিয়া দুই হাত দিয়া মাল্যের দৈর্ঘ্য নি[illegible] করিল।

সুরবালা কহিল, এত ভাল ছেলে! বয়স কত?

প্রায় বাইশ বছর।

ছেলের বিয়ে দিচ্ছেন না?

দিতে তো চান। মনের মত পাচ্ছেন কই! কত রাজা-রাজড়ার বাড়ি থেকে তো সম্বন্ধ আসছে। কিন্তু ওঁদের পছন্দ হচ্ছে না। ঘর পছন্দ হয় তো মেয়ে হয় না, মেয়ে পছন্দ হয় তো ঘর হয় না।

সুরবালা একটু ইতস্তত করিয়া কহিলেন, আমার মাধুর সঙ্গে হয় না?

শৈলজা মুখ চোখ ঘুরাইয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিল, হয় ব'লে হয়, একেবারে হরগৌরী মিলন হয়। বলেন তো মিত্তির মশায়ের কাছে কথাটা পেড়ে দেখতে পারি।

সুরবালা গম্ভীর হইয়া কহিলেন, না, এখন কথা পেড়ে কাজ নেই। তুমি বরং ছেলেটিকে এখানে একবার এনো। নিজের চোখে আমি দেখব। তা ছাড়া ছেলে মেয়েও দুজন দুজনকে দেখুক। যদি ওদের ভাল লাগে, বিয়ে করতে ইচ্ছে হয় তো বিয়ে হবে। না হ'লে টেনে হিঁচড়ে একজনকে আর একজনের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে সারাজীবন ধ'রে জ্বালাতন-পোড়াতন আমি চাই না।—বলিয়া নিজের ব্যর্থ বিবাহিত জীবনকে স্মরণ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

সেই দিনই শৈলজা ঘনশ্যামকে সংবাদ দিল। ঘনশ্যাম ইহারই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। একে তো নাবালকের সম্পত্তি দেখিলেই আইনজীবীদের জিহ্বায় জল ঝরিতে থাকে। তাহার উপর নাবালিকা—মৃত পিতার একমাত্র কন্যা, তাঁহার স্বজাতি ও স্বঘর। অতএব কোনমতে বিবাহ-ফাঁদে ফেলিতে পারিলে টানিয়া সমস্ত সম্পত্তি ঘরে তুলিতে পারিবেন। ঘনশ্যাম, মনোজ বাড়ি আসিলেই তাহাকে শৈলজার কাছে পাঠাইয়া দিবেন, স্থির করিলেন।

পূজার পর একদিন সকালে ঘনশ্যামবাবু মনোজকে ডাকিয়া খাওয়ার কথা বলিবেন বলিয়া মনে করিতেছেন, এমন সময়ে এক ফ্যাসাদ ঘটিল। ভৃত্য রঘু পোস্ট-অফিস হইতে সকালের ডাক আনিতে গিয়াছিল। তাহার হাতে একটি চৌকোণা খাম দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কার চিঠি রে?

রঘু জবাব দিল, দাদাবাবুর।

দেখি।—বলিয়া খামখানি লইয়া দেখিলেন, পরিষ্কার মেয়েলী ছাঁদে ইংরেজীতে নাম ও ঠিকানা লেখা। স্ট্যাম্পের ছাপ দেখিয়া বুঝিলেন, চিঠিখানি কলিকাতা হইতে আসিতেছে। মনটা ছাঁত করিয়া উঠিল। কলিকাতা হইতে কোন্ মেয়েমানুষ মনোজকে চিঠি লিখিতে পারে? আত্মীয়া তো নয়ই, হয় বান্ধবী, নয় প্রণয়িনী। দুইই বিপজ্জনক। কারণ বান্ধবী প্রণয়িনী হইতে কতক্ষণ? ডজনখানেক কুহু, দমকা দুই দখিনা বাতাস, ঝলক কয়েক জ্যোৎস্না পার্শ্ববর্তিনীকে যে কোন মুহূর্ত্তে বক্ষবর্তিনী করিতে পারে। অতএব? শৈলজা-প্রেরিত জমিদারি-সংক্রান্ত চিঠিপত্র দূরে সরাইয়া দিয়া, ঘনশ্যাম চেয়ারে ঠেস দিয়া, কড়িকাঠের দিকে তাকাইয়া, চিন্তিত ও বিরস মুখে বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে রঘুকে দরজার সামনে দিয়া যাইতে দেখিয়া ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোর দাদাবাবু কোথায় রে?

রঘু কহিল, সাইকেল নিয়ে এখনই বেরিয়ে গেলেন। ঘনশ্যাম কক্ষ হইতে বাহির হইয়া মনোজের শয়নকক্ষের দিকে চলিলেন।

কক্ষটি মাঝারি আয়তনের। এক দিকে একটি সাধারণ পালঙ্কে মনোজের বিছানা অত্যন্ত অগোছালোভাবে পাতা ছিল। আর এক দিকে দেওয়াল ঘেঁষিয়া দুইটা পাশাপাশি টেবিলের উপর মনোজের যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্য—বই, খাতা, লেটার-প্যাড, দোয়াত, কলম, আয়না

চিরুনি, বিলাতী মেমের ছবিওয়ালা ক্যালেণ্ডার, টুথপেস্টের দুমড়ানো টিউব, দাঁত মাজিবার ব্রাশ ইত্যাদি জড় করা ছিল। ঘনশ্যাম ঘরে ঢুকিয়া সটান টেবিলের কাছে গিয়া বইগুলা খুলিয়া খুলিয়া দেখিতে লাগিলেন। লেটার-প্যাড তন্নতন্ন করিয়া খুঁজিলেন, খাতাপত্র উল্টাইলেন। শেষে বিছানা হাতড়াইতে লাগিলেন। অবশেষে গদির নীচে হইতে চিঠিখানি টানিয়া বাহির করিলেন। চিঠিতে লেখা ছিল—

মনু

আর কতদিন সেখানে থাকবে? আমার যে দিন কি ক'রে কাটছে, আমিই জানি। ভারি ভয় হচ্ছে আমার। তুমি আর দেরি ক'রো না, লক্ষ্মীটি! শিগগির চ'লে এস এখানে। মা-বাবার মত নিয়েছ কি? যত শিগগির বিয়ে হয় ততই ভাল। বাবার মতের জন্যে চিন্তা নেই।

তোমারই

সুধা

পুঃ

চিঠি পেয়েই চ'লে এস, লক্ষ্মীটি! চুমু নাও—আর প্রণাম—

সু—

চিঠিখানা পড়িয়া ঘনশ্যাম বিছানার উপরেই বসিয়া পড়িলেন। হাতটি কাঁপিতে লাগিল এবং কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটিয়া উঠিল। ঘাড় নাড়িয়া ক্ষোভের সহিত কহিলেন, যা ভেবেছি তাই! আমার কপালে তেঁতুল গুলেছে বেটা। কপালে করাঘাত করিয়া কহিলেন, আমার অদেষ্ট! সইবে কেন? ছিঃ ছিঃ, এতবড় জমিদারিটা হাতছাড়া হয়ে গেল! হঠাৎ রাগে দাঁত কিড়মিড় করিয়া কহিলেন, হতচ্ছাড়ী [illegible]! বিয়ে করবেন আমার ছেলেকে! করাচ্ছি বিয়ে! একটি পা [illegible]তে দোব না বাড়ি থেকে।—বলিয়া রাগে গরগর করিতে করিতে

টরটর করিয়া রান্নাঘরে আসিয়া স্ত্রীকে হাঁকিয়া কহিলেন, ওগো, শুনছ ? একবার শুনে যাও দিকি, এখখুনি।—বলিয়া নিজের শয়নকক্ষে আসিয়া একটা চেয়ার টানিয়া গুম হইয়া বসিয়া রহিলেন।

ঘনশ্যাম-গৃহিণী ইন্দুমতী সিক্ত হস্ত কাপড়ে মুছিতে মুছিতে আসিয়া সামনে দাঁড়াইলেন। ঘনশ্যাম চিঠিখানা পত্নীর হাতে দিয়া গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিলেন, পড়। গৃহিণী চিঠিখানি পড়িয়া ঔৎসুক্যের সহিত কহিলেন, কার চিঠি ? কে লিখেছে ? কিচ্ছু বুঝতে পারছি না তো !

ঘনশ্যাম ক্রুর দৃষ্টিতে পত্নীর দিকে তাকাইয়া ক্রোধোচ্ছ্বাসকে সবলে চাপিয়া রাখিয়া চাপা স্বরে কহিলেন, বুঝতে পারছ না কার চিঠি ? তোমার গুণের ছেলে মন্টুর, প্রেম করেছে।

গৃহিণী ঘাবড়াইয়া গিয়া কহিলেন, সে কি গো ! তারপর ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, না বাবু, এ আমি বিশ্বাস করি না। কেউ মিথ্যে ক'রে লিখেছে এ কথা। মন্টু আমার কখনও এ কাজ করতে পারে না।

ঘনশ্যাম ব্যঙ্গের সহিত কহিলেন, করতে পারে না ! সব জান তো তুমি ! কড়া গলায় কহিলেন, খুব করতে পারে। আর করেছেও। এখন কিছু উপায় করতে পার তো করগে, নইলে হয় আমি নিজে দেশান্তরী হব, নয়তো ওই ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করব।

গৃহিণী নাকী স্বরে ক্রন্দনের ভান করিয়া কহিলেন, বারে ! আমি কি উপায় করব ?

ঘনশ্যাম ধমকাইয়া কহিলেন, উপায় করতে পারবে না তো অমন ছেলে পেটে ধরেছিলে কেন ? নুন খাইয়ে আঁতুড়ে মেরে ফেলতে পার [illegible]

গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়া কহিলেন, পেটে ধরেছি ব'লেই ছেলে কি আ[illegible] একার ? যখন ভাল ক'রে পাস করে, জলপানি পায়, তখন তো[illegible]

বল না? তখন 'আমার ছেলে, আমার ছেলে' ব'লে গোঁফ ফরকিয়ে ঘুরে বেড়াও। এখন দোষ করেছে কিনা, তাই শুধু আমার একার ছেলে, দায় শুধু আমারই। পারব না আমি কিছু করতে, যা পার তুমি করগে। —বলিয়া চিঠিটা ঘনশ্যামের মুখের উপর নিক্ষেপ করিয়া গৃহিণী সক্রোধে দ্রুতপদে দরজার দিকে চলিলেন।

ঘনশ্যাম হাঁকিয়া কহিলেন, দেশান্তরী হব কিন্তু।

গৃহিণী জবাব দিলেন, যা ইচ্ছে করগে।

ঘনশ্যাম দ্বারের কাছে আসিয়া ডাক দিয়া কহিলেন, শুনছ?

গৃহিণী অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিলেন, থামিয়া মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, কি বলছ, বল না?

গৃহিণী ফিরিলেন। ঘনশ্যাম শান্ত স্বরে কহিলেন, রাগারাগি ক'রে কিছু ফল হবে না। ভারি বিপদ! উপযুক্ত ছেলে হাতছাড়া হতে বসেছে। যে কোন প্রকারে হোক, ওর মন ফেরাতেই হবে। তুমি মা, তার ওপর মেয়েমানুষ, চোখের জল তোমাদের হাতধরা; দু ফোঁটা সময় আর সুযোগ মত ফেলতে পারলে ছেলের মন ভিজবে। আমি ওকে বোঝাতে পারি, ধমক দিতে পারি, কিন্তু তাতে কোন কাজ হবে না।

গৃহিণী চুপ করিয়া নীরবে ঘনশ্যামের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

ঘনশ্যাম বলিতে লাগিলেন, এমন কি, আমি কিছু জানতে পেরেছি, সে কথা পর্য্যন্ত ওর না জানাই ভাল। তুমি বলবে যে, ওর বিছানা ঝাড়তে ঝাড়তে চিঠিখানা পেয়েছ। যেমন ক'রে হোক ওকে বোঝাবে যে, এ মেয়েকে ঘরে আনা চলবে না। এ মেয়ে ঘরে এলে উচ্ছন্ন যেতে [illegible] সবাইকে। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, তুমি ভাল ক'রে বোঝাও। আমিও অন্যভাবে বোঝাব।' কলকাতা যাওয়া ওর এখন [illegible]'রে দিয়ে শৈলর কাছে থাকবার ব্যবস্থা ক'রে দোব। পরীক্ষা এখন

থাক। তা ছাড়া জমিদারিটা যদি হাতে আসে, পড়াশুনা করবার ওর আর দরকার হবে না, পায়ের ওপর পা দিয়ে সারাজীবন খেতে পারবে।

সেই দিন দুপুরবেলায় আহারাদির পর পান চিবাইতে চিবাইতে ইন্দুমতী পুত্রের শয়নকক্ষে পদার্পণ করিলেন। মনোজ একটা ডেক-চেয়ারে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় কড়িকাঠের দিকে তাকাইয়া ভাবিতেছিল। মায়ের পদশব্দ বোধ করি শুনিতে পাইল না। ইন্দুমতী কিছুক্ষণ পুত্রের মুখের পানে তাকাইয়া রহিলেন—মুখ শুষ্ক, বিষণ্ণ ও চিন্তাকুল। ইন্দুমতীর বুকের ভিতরটা মুচড়াইয়া উঠিল। আহা! ছেলেমানুষ। হয়তো মেয়েটাকে সত্যিই ভালবাসে। ভাবিলেন, না বাপু! কাজ নেই বিয়ে বন্ধ ক'রে। শেষে কি হতে কি হবে, কে জানে! হয়তো বিরাগী হয়ে বেরিয়ে যাবে, কি হয়তো—হয়তো—বিষ—ষাট ষাট! কাজ নেই এত হাঙ্গামায়, যা ইচ্ছে ওর করুক। কিন্তু স্বামীর রক্তচক্ষু মনে পড়িয়া ইন্দুমতী বিষম খাইয়া কাসিয়া ফেলিলেন। মনোজ মুখ ফিরাইয়া মাকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, মা, তুমি বোধ হয় আমার মনের কথা জানতে পার। ইন্দুমতী কাসিতে লাগিলেন। একটু সামলাইয়া চোখ মুছিতে মুছিতে রুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, কেন বল্ দেখি?

মনোজ কহিল, বলছি, তুমি ব'স আগে।—বলিয়া ডেক-চেয়ারে তাঁহাকে বসাইয়া দিল। তারপর কুজা হইতে এক গ্লাস জল লইয়া তাঁহার হাতে দিল। ঢকঢক করিয়া জলটা গিলিয়া ইন্দুমতী একটু সুস্থ হইলেন। তারপর অঞ্চলপ্রান্তে চোখ মুছিতে মুছিতে বিকল কণ্ঠে কহিলেন, কি বলছিলি তখন?

মনোজ কহিল, বলছিলাম, তুমি আমার মনের কথা জানতে পার।

ইন্দুমতী ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, কেন বল্ দেখি?

এতক্ষণ তোমাকেই আমি মনে মনে ডাকছিলাম।

কেন? আমি কি ম'রে গেছি যে, মনে মনে ডাকছিলি। চেঁচিয়ে ডাকতে পারিস নি?

আমি আজ তোমাকে পরীক্ষা করছিলাম। এমনই তুমি প্রায় বল যে, কলকাতায় আমার বিপদ-আপদ হ'লে এখানে ব'সে জানতে পার; সেটা সত্যি কি না দেখবার জন্যে তোমাকে মনে মনে খুব ডাকছিলাম; কিন্তু তুমি পরীক্ষায় পাস করেছ মা।

মনে মনে হাসিয়া ইন্দুমতী কহিলেন, কেন এত ডাকছিলি? কি বিপদে পড়েছিস?

মনোজ একটি চেয়ার টানিয়া মায়ের কোল ঘেঁষিয়া বসিল; তারপর মায়ের দুইটি হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া কহিল, ঠিক বিপদ নয় মা! একজনকে একটি কথা দিয়েছি। কথা না রাখলে অত্যন্ত অধর্ম্ম হবে, অথচ তোমার মত না হ'লে কথা রাখতে পারি না।

ইন্দুমতী বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিলেন, কাকে আবার কি কথা দিয়েছিস?

মনোজ ঢোক গিলিয়া কহিল, একটি মেয়েকে বিয়ে করব বলেছি।

ইন্দুমতী নীরস কণ্ঠে কহিলেন, এ কথা তুই বলতে গেলি কেন; যখন জানিস, তোর নিজের মতে বিয়ে হবে না।

মনোজ মুখ লাল করিয়া ও ভূমিতলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, মেয়েটিকে আমি ভালবেসেছি মা।

ইন্দুতমী যেন ভাল শুনিতে পাইলেন না, এমনই ভান করিয়া কহিলেন, কি করেছিস?

মনোজ সলজ্জ হাসি হাসিয়া কহিল, ভালবেসেছি।

ইন্দুমতী কহিলেন, ভালবেসেছিস তো কি হবে? ভালবাসলেই করতে হবে, তার কোন মানে নেই।

মনোজ বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, সে কি মা?

হাঁ্যা বাবা, তাই। ভালবাসা কদিন থাকে? বিয়ের আগে আমার এক বন্ধু ছিল; এত ভালবাসতাম তাকে যে, এক দণ্ড চোখের আড়াল হ'লে অস্থির হতাম, একসঙ্গে খেতাম, একসঙ্গে শুতাম—

মনোজ পরম বিস্ময়ের সহিত কহিল, সে কি মা? পুরুষ বন্ধু?

ইন্দুমতী হাসিয়া কহিলেন, দূর বোকা ছেলে! পুরুষ বন্ধু কেন হবে! মেয়েমানুষ, আমার এক পিসী, আমার সমবয়সী, কিন্তু বিয়ে হবার পর কোথায় গেল ভালবাসা, কোথায় গেল বন্ধুত্ব! এখন বৎসরান্তে একদিনও তার কথা মনে পড়ে না।

মনোজ প্রতিবাদ করিয়া কহিল, মেয়ে-পুরুষের ভালবাসা অন্য রকমের।

ঘাড় নাড়িয়া ইন্দুমতী কহিলেন, তা নয় বাবা। ও ভালবাসা আরও ঠুনকো, একটু মনের কি মতের তারতম্য হ'লেই ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। নইলে, শোন নি, বিলেতের মেয়ে-পুরুষ আজ একজন একজনকে ভালবাসছে, কালই তার সঙ্গে চুলোচুলি ক'রে ভেগে পড়ছে।

মনোজ কহিল, সত্যিকার ভালবাসায় তা হয় না মা।

ইন্দুমতী হাসিয়া কহিলেন, ভালবাসার আসল-নকল বোঝা যায় নাকি? সবই মনে হয় আসল। কেঁচোর মধ্যে যে কাঁটা আছে, তা না বুঝে যারা গেলে, তাদের দুর্দ্দশার আর সীমা থাকে না।

মনোজ কহিল, কিন্তু তাকে বিয়ে না ক'রে আমার উপায় নেই মা। —বলিয়া মুখ নীচু করিল।

ইন্দুমতী গম্ভীর হইয়া কহিলেন, তা যখন বলছ বাছা, তবে আমিও দেখাই।—বলিয়া শেমিজের ভিতর হইতে চিঠিখানা বাহির করিয়া কহিলেন, এ চিঠিটি কার বাছা?

বিস্ময়াহত কণ্ঠে মনোজ কহিল, এ চিঠি তুমি কোথায় পেলে মা?

পেলাম তোমার বিছানার ভেতর থেকে, বিছানা ঝাড়তে ঝাড়তে। তা এ চিঠিটি কি সেই মেয়ের ?

মনোজ 'হাঁ'-সূচক ঘাড় নাড়িয়া কহিল, তুমি পড়েছ ?

ইন্দুমতা স্বীকার করিলেন। মনোজ কহিল, তবে তো তুমি সবই জানতে পেরেছ মা। আমি কি করব, বল ?

ইন্দুমতী গম্ভীর হইয়া কহিলেন, তোমার কিছু ক'রে কাজ নেই বাবা। ও মেয়ের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রেখো না।

মনোজ কহিল, সে কি মা ? তুমি মেয়েমানুষ হয়ে এই কথা বলছ ?

ইন্দুমতী তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিলেন, হ্যাঁ, বাবা। একজন অচেনা পুরুষের সঙ্গে যে মেয়ের এত মেশামেশি করতে বাধে না, তাকে আমার বউ ক'রে ঘরে তুলতে পারব না বাছা। তুমি যাই বল।

আমি যে তাকে ঘরে আনব ব'লে কথা দিয়েছি মা।

আমরা যতদিন বেঁচে আছি, তোমার কথার দাম কি বাবা ? তারই ওপর নির্ভর ক'রে যে মেয়ে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারে, তারই বা দাম কি ?

ছিঃ মা! ও কথা তুমি ব'লো না। সে তোমার ভাবী পুত্রবধূ।

ইন্দুমতী দৃঢ় কণ্ঠে কহিলেন, না, সে আমার পুত্রবধূ কখনও হবে না। সেই মেয়ে যদি ঘরে আসে, তোমার বাবা দেশত্যাগী হবেন, আমি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করব। তারপর কণ্ঠ ও চক্ষু দুইই অশ্রুসজল করিয়া কহিলেন, এত ক'রে তোকে মানুষ করলাম, সে কি এর জন্যে ? কত সাধ, কত আশা, একটি মনের মত বউ আনব, যে সংসারকে সাজিয়ে গুছিয়ে সুন্দর ক'রে তুলেছি, তা তার হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ মুদব, সে সাধ সে আশা তুই এমনই ক'রে ভেঙে গুঁড়ো ক'রে দিতে চাস ? তোর বাবার খাওয়া নেই, ঘুম নেই, দিনরাত খাটছেন, ভাবছেন,

ছেলে উপযুক্ত হবে, সব ভার তার হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবেন, তাঁকে তুই এমনই ক'রে নিরাশ করবি ? ওঁর শরীর বড় খারাপ, বুকের দোষ হয়েছে ; ডাক্তার বলেছে, একটু আঘাত পেলে বাঁচবেন না।—বলিয়া কণ্ঠস্বরকে একেবারে ভাঙিয়া ফেলিয়া অঞ্চলপ্রান্তে চক্ষু মুছিতে লাগিলেন। এতবড় বক্তৃতা এমন করিয়া গুছাইয়া যথারীতি ভাব ও ভঙ্গী সহকারে বলিতে পারিবেন, ইন্দুমতী ভাবেন নাই। অতএব মনে মনে নিজেকে তারিফ করিতে লাগিলেন এবং মনোজের দিকে দুই জলসিক্ত চোখ মেলিয়া তাকাইয়া তাহার উপর বক্তৃতার ফল লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। মনোজ কহিল, সে মেয়েকে দেখ নি মা, তাই তার ওপর অবিচার করছ। তার মা নেই, বাবা প্রায় শয্যাশায়ী, আপনার বলতে আর কেউ নেই। একা সংসারের সব ওকে দেখতে হয়, চাকরবাকরদের সামলাতে হয়, হিসেবপত্র রাখতে হয়, অতিথি-অভ্যাগতকে আপ্যায়ন করতে হয়, তার ওপর দিনরাত ওর বাবার সেবা করতে হয়। ও মেয়ে যে সংসারেই যাবে মা, ওর হাতে সেই সংসার সুন্দর হয়ে উঠবে।

ইন্দুমতী প্রশ্ন করিলেন, ওর আর ভাই বোন কেউ নেই ?

মনোজ ঘাড় নাড়িল। ইন্দুমতী কহিলেন, বেশ তো, ওর বাবা দেখে শুনে একটি ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ঘরজামাই করুন।

তা কি ক'রে হবে মা ?—বলিয়া মনোজ মুখ নামাইল।

খুব হবে বাবা, আজকাল অনেক হচ্ছে। তুই মোট কথা ওর পথে আর পা দিস নি, ভালবাসাটাসা সব মিথ্যে, তোকে ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করছে ওই মেয়ে।

মনোজ প্রবল বেগে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, তা হয় না মা, ও সেসব জানে না।

মেয়েটির উপর পুত্রের দরদ দেখিয়া ইন্দুমতীর ক্রোধের উদ্রেক হইল। অধর কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, জানে না! সব জানে। বাপ-বেটাতে পরামর্শ ক'রে এই ফন্দি করেছে। জানে, ভাল ছেলে, অবস্থাও ভাল, অমনই তার ঘাড় মটকাবার চেষ্টা! কলকাতার মেয়ের ক্ষুরে নমস্কার!— বলিয়া ভক্তিভরে দুই যুক্ত হস্ত কপালে ঠেকাইলেন।

মনোজ চুপ করিয়া চিন্তিত মুখে বসিয়া রহিল। ইন্দুমতী মনোজকে চিন্তিত দেখিয়া আশান্বিতা হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, তা ছাড়া আজকালকার মেয়ে, স্কুল-কলেজে পড়ে, ট্রামে বাসে একা যাওয়া-আসা করে, সকলের সঙ্গেই আলাপ করে, তা হ'লে শুধু তোর সঙ্গেই এত ঘনিষ্ঠতা হ'ল কি ক'রে?—বলিয়া সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে পুত্রের দিকে তাকাইলেন।

ভালবাসার জন্ম-ইতিহাস, আর যাহাকেই হউক, মা-বাবাকে খুলিয়া বলা যায় না। কাজেই মনোজ চুপ করিয়া রহিল।

উত্তরের আশায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া ইন্দুমতী কহিলেন, আমার মত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তোর কেউ নেই। আমি বার বার বলছি, এসব কথা মন থেকে মুছে ফেলে দে। যেমন ক'রেই হোক, ভুল হয়তো করেছিস, কিন্তু তাই ব'লে সেই ভুলের জের টেনে নিজেও জ্বলিস না, আমাদেরও জ্বালাস না। আমার অনেক সাধ বাছা, তাতে বাদ সাধলে জীবনে কোন দিন সুখী হতে পারবি না, আমি ব'লে দিচ্ছি।

মনোজ গুম হইয়া নতমুখে বসিয়া রহিল। ইন্দুমতী তাহার মাথায় পিঠে হাত বুলাইয়া কহিলেন, কেন এত মন-খারাপ করছিস? ওর ভাবনা একবারও মনে ঢুকতে দিস না। দেখবি, দুদিন পরে একেবারে ভুলে যাবি। আর এক কাজ কর্, তোর বাবা বলছিলেন, কি কাজে ওঁকে শৈলর কাছে যেতে হবে। তা ওঁর বদলে তুইই যা। কাজে ডুবে থাকলে মন দুদিনে পরিষ্কার হয়ে যাবে। বার দুই হাই তুলিয়া কহিলেন, যাই

একটু গড়িয়ে নিইগে।—বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই মনোজ কহিল, মা, বাবাকে একবার ব'লে দেখব? ওঁর হয়তো অমত না হতেও পারে।

পিতৃচরিত্র সম্বন্ধে পুত্রের অভিজ্ঞতা দেখিয়া ইন্দুমতী মনে মনে হাসিলেন। প্রকাশ্যে দুই চোখ কপালে তুলিয়া কহিলেন, সর্ব্বনাশ! এমন কাজ কখন ক'রো না বাবা! ওঁর একে বুকের দোষ! ঘুণাক্ষরে এ কথা জানতে পারলে ওঁকে বাঁচানো দায় হবে।

সেই দিনই সন্ধ্যার পর ঘনশ্যামের শয়নকক্ষে মনোজের ডাক পড়িল। মনোজ মনে মনে সওয়াল-জবাবের খসড়া করিতে করিতে কক্ষে প্রবেশ করিল। কক্ষ প্রায় অন্ধকার। এক কোণে একটি লণ্ঠন মৃদুভাবে জ্বলিতেছিল। ঘনশ্যাম বিছানায় শুইয়া ছিলেন। পাশে বসিয়া ঘনশ্যাম-গৃহিণী বোধ করি বুকে হাত বুলাইতেছিলেন। সারা কক্ষে এমনই একটি থমথমে ভাব বিরাজ করিতেছিল যে, মনোজের পদশব্দ স্বতই মৃদু হইয়া আসিল। বিছানার কাছে আসিয়া মাকে মুখের ইঙ্গিতে প্রশ্ন করিল, কি হয়েছে? ইন্দুমতী বাম হাত নিজের বুকে ঠেকাইয়া ফিসফিস করিয়া কহিলেন, বেদনাটা বেড়েছে, ব'স। ঘনশ্যামের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, একটু ঘুম এসেছে বোধ হয়। ঘনশ্যাম কথা বলিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু গৃহিণীর এই কথার পর আর কথা বলা চলিল না; অতএব চুপ করিয়া গেলেন। কিন্তু গৃহিণীর উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। ঘুম এসেছে বোধ হয়! কেন, চুপ করিয়া এমনই বুঝি পড়িয়া থাকা চলে না? মনোজ পিতার শারীরিক অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত ঘাবড়াইয়া গেল। দুপুরবেলায় মায়ের কথা মনে পড়িয়া গেল, বুকের বেদনায় কোন কথা বলিলেই বাঁচানো দায় হইবে। তবে? ওদিকে সুধার হৃদয়-বেদনা, এদিকে বাবার হৃৎপিণ্ডের বেদনা—দুইই একসঙ্গে চাড়া দিয়া উঠিয়াছে। মনোজ কোন্ দিক সামলাইবে?

এমন সময় ঘনশ্যাম পাশ ফিরিয়া শুইলেন। ইন্দুমতী কহিলেন, মনু এসেছে।

ঘনশ্যাম ক্লিষ্ট কণ্ঠে কহিলেন, এসেছে! আয়, আমার কাছে ব'স্।

মনোজ আদেশ পালন করিল। ঘনশ্যাম কহিলেন, মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দে।

মনোজ উৎকণ্ঠার সহিত প্রশ্ন করিল, কখন থেকে হয়েছে? ঘনশ্যাম মৃদু কণ্ঠে থামিয়া থামিয়া কহিতে লাগিলেন, হয়েছে মাস কয়েক হ'ল, তুই তখন কলকাতায় ছিলি। দীনবন্ধু ডাক্তারকে ডেকেছিলাম, তিনি বললেন, এ সারবে না। মাঝে মাঝে দেখা দেবে, তারপর একদিন মরণ-কামড় দেবে আর কি!

মনোজ কহিল, একবার কলকাতা গিয়ে দেখালে হয় না?

ঘনশ্যাম স্বগত কহিলেন, কলকাতা যাব বইকি! না হ'লে মজা হবে কেন? প্রকাশ্যে ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, কিছু হবে না। স্বয়ং ধন্বন্তরিরও সাধ্য নেই সারাবার। একটু দম লইয়া কহিলেন, সাবধানে থাকতে হবে, বেশি ভাবনা-চিন্তা করা চলবে না। এমনই ভাবে থাকলে হয়তো কিছুদিন টিকে যেতে পারি, কিন্তু—

ইন্দুমতী কহিলেন, শৈল যে যেতে বলেছে বলছিলে, তা এ শরীরে নিজে না গিয়ে মনুকেই পাঠিয়ে দাও। ও তো আইন-টাইন সব শিখেছে, আর একটা পরীক্ষা দিলেই তো পাকা উকিল হবে।

ঘনশ্যাম ক্লান্তভাবে কহিলেন, গেলে তো খুব ভাল হয়। আইন জানার তত দরকার নেই। সেখানে গিয়ে বসলেই আপনা হতে কাজ হয়ে যাবে। শৈল তো সব দেখতে শুনতে পারে না, আর কাজ জানেও না।

মনোজ কহিল, আমার যে পরীক্ষা—

বাধা দিয়া ঘনশ্যাম কহিলেন, পরীক্ষা এখন থাক। পরের বার দিলেও চলবে। কলেজ তো আর যেতে হবে না, ওখান থেকেই তৈরি হতে পারবি, তা ছাড়া জমিদারির কাজ দেখাশুনা করলে প্র্যাক্‌টিক্যাল ট্রেনিংটাও হবে।

ইন্দুমতী কহিলেন, হ্যাঁ বাছা, তাই যা, আর অমত করিস নি। উনি বেঁচে থাকলে পরীক্ষে তোর পালাবে না।

ঘনশ্যাম কহিলেন, কাল কি পরশু চ'লে যা। কিছু কষ্ট হবে না সেখানে। শৈল রয়েছে। তা ছাড়া মৃত্যুঞ্জয়বাবুর স্ত্রী তো একেবারে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী।

গৃহিণী মনে মনে বোধ করি চটিলেন। সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, না ঢেঁকি! এই বয়সেই তো স্বামীর মাথাটি খাইয়া বসিয়া আছে! দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সক্ষোভে কহিলেন, লক্ষ্মী আর কি ক'রে বলছ গো, সিঁথির সিঁদুরই বজায় রাখতে পারলে না—

ঘনশ্যাম কহিলেন, ও বেচারী আর কি করবে বল? মৃত্যুঞ্জয়টা একেবারে মদে ডুবে রইল কিনা, লিভার প'চে থসথসে হয়ে গেল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, ভারি বিপদে পড়েছিল বেচারা, চারিদিকে শত্রু, ভাগ্যে গিয়ে পড়েছিলাম, তাই জমিদারি রক্ষা হ'ল; না হ'লে পথে দাঁড়াতে হ'ত; যাক, ভগবানের ইচ্ছেয় সব সুরাহা হয়েছে। এখনও একটু বাকি, সেইটুকু হ'লেই আমার ছুটি।—বলিয়া গভীর ক্লান্তির সহিত চক্ষু মুদিয়া বোধ করি বাকিটুকুর সুরাহার সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঘনশ্যাম মৃত্যুঞ্জয়ের কথা ভাবিতে লাগিলেন, না তস্য পত্নীর কথা ভাবিতে লাগিলেন, তাহা ঠাহর করিতে না পারিয়া ইন্দুমতীর অস্বস্তির সীমা রহিল না।

দিন দুই পরে মাতৃ-আশীর্ব্বাদ মস্তকে ও পিতৃ-আশীর্ব্বাদ পৃষ্ঠে লইয়া

মনোজ পিতৃকর্ত্তব্য পালনের জন্য যাত্রা করিল। কিন্তু তৎপূর্ব্বে ঘনশ্যাম পত্র দ্বারা শৈলজাকে সমস্ত বিষয় জানাইলেন এবং মনোজকে চোখে চোখে রাখিতে ও কলিকাতায় যাহাতে চিঠিপত্র লিখিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে উপদেশ দিলেন।

২

সুধা ও মনোজের প্রণয়োৎপত্তির ইতিহাস যতদূর জানা গিয়াছে, তাহা এই—

মফস্বল কলেজে বি. এ. পাস করিয়া কলিকাতায় এম. এ. ও ল পড়িতে আসিবার সময়ে মনোজ সঙ্কল্প করিল যে, কলিকাতায় শুধু পড়াশুনার চর্চ্চা করিলে চলিবে না, রীতিমত প্রেম-চর্চ্চাও করিতে হইবে। কিন্তু কলিকাতায় পা দিয়া, ডাঙার মানুষ সমুদ্রে নামিলে যেমন অবস্থা হয়, তাহার অবস্থাও অনেকটা সেই রকম দাঁড়াইল। মাথা উঁচু করিয়া খাড়া দাঁড়াইয়া থাকিবার জন্যই এমনই কসরৎ করিতে হইল যে, প্রেম-চর্চ্চা দূরে থাক, চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিবার পর্য্যন্ত সময় বা সামর্থ্য থাকিল না। অবশ্য অভ্যস্ত হইতে বেশি দিন লাগিল না। কলিকাতা-সুলভ চাল-চলন, হাব-ভাব ও কথা-বার্ত্তা আয়ত্ত হইল। এমন কি সুযোগও দুই-একটি করিয়া হাতের কাছে আসিতে লাগিল, কিন্তু কখনও সাহস, কখনও নিপুণতা, কখনও বা নিছক দুর্ভাগ্যের জন্য হাত-ছাড়া হইয়া গেল। যথা—ট্রামে উঠিয়া বসিয়াছে; অত্যন্ত ভিড়; একজন সুবেশা সুন্দরী তরুণী ট্রামে উঠিবামাত্র সবার আগেই নিজের জায়গাটা ছাড়িয়া দিয়া মনোজ তরুণীর বসিবার ব্যবস্থা করিল; কিন্তু তরুণী একটু মুচকি হাসিয়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা দূরে থাক, একবার

ফিরিয়া তাকাইয়াও, সে যে তাহারই জন্য দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কি রকম ঝাঁকানি খাইতেছে, দেখিল না; তাহার উপর, হয়তো পার্শ্বের যুবকের সঙ্গে—যে গ্যাঁট হইয়া বসিয়া ছিল, আধ ইঞ্চিও উঠিয়া দাঁড়ায় নাই—হাসিয়া হাসিয়া আলাপ করিতে লাগিল। কিংবা হয়তো কলেজে তাহাদের ক্লাসের কোন মেয়ে তাহাদেরই ক্লাসের একজন ছেলের সঙ্গে হাস্যমুখে কোন বিষয়ে আলোচনা করিতেছে; পাশে দাঁড়াইয়া শুনিতে শুনিতে সাহস করিয়া মনোজ আলোচনায় যোগদান করিবার চেষ্টা করিতেই মেয়েটি ভ্রূকুটি-কুটিল মুখে তাহার দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে একেবারে বিযুক্ত করিয়া দিল। একবার মনোজ এস্‌প্ল্যানেড হইতে কলেজ স্কোয়ার পর্য্যন্ত একটি মেয়ের সহিত একলা ট্রামে আসিয়াছিল, প্রায় পাশাপাশি বসিয়া থাকিয়াও একটি কথা বলিতে সাহস করে নাই। আর একবার একটি তরুণীর সঙ্গে কথাবার্ত্তার চেষ্টা করিতেই বুকের ভিতরটা এমনই দাপাদাপি শুরু করিয়া দিল যে, অর্দ্ধপথে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া তরুণীর বিস্ময় ও কৌতুকের উদ্রেক করিয়াছিল। রাস্তায় ও কলেজে বিফল-মনোরথ হইয়া মনোজ আশেপাশে ভদ্রলোকদের বাড়িতে হানা দিল। কিন্তু ফলের কোন তারতম্য হইল না। কোন ভদ্রলোক হয়তো 'মেসের ছেলে' এই পরিচয় পাইবামাত্র মুখের উপর দরজা বন্ধ করিয়া দিল। আর যদি বা কোন ভদ্রলোক আপ্যায়িত করিয়া বসাইল তো খোঁজ করিয়া দেখা গেল, হয় তাহার গৃহে—তরুণী দূরে থাক, স্ত্রীলোকের নামগন্ধ নাই, নয় একটি কালো কুৎসিত ধাড়ী আইবুড়ো মেয়ে ঘাড়ে চাপিবার জন্য ওত পাতিয়া বসিয়া আছে।

কবিরা বলেন—প্রেমের দেবতা অন্ধ। কিন্তু মনোজের দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, প্রেমের দেবতা অন্ধ নহে, একচোখো। ব্রিটিশ সরকার পর্য্যন্ত তাঁহার কাছে হার মানিয়া যায়। না হইলে কলিকাতার ছেলেগুলা,

বাংলা দেশের মুসলমানদের মত বোধ হয় শুধু সংখ্যাধিক্যের জোরেই, ঘৃত-ননী-সর-দুগ্ধ সব সাবাড় করিতেছে, অথচ মফস্বলের ছেলেদের ভাগ্যে তলানিটুকু পর্য্যন্ত জুটিতেছে না কেন? এ সম্বন্ধে এজিটেশন দরকার, কিন্তু করিবে কাহারা? পশ্চিমবঙ্গের ছেলেগুলি চোখে চশমা আঁটিয়া কুঁজা হইয়া বসিয়া, নোটের পাতা চাটিয়া চাটিয়া শেক্স্পীয়রের রস-আস্বাদনে এমনই ব্যস্ত যে, আর কোনও বিষয়ে তাহাদের ঔৎসুক্য নাই, উৎসাহও নাই। আর পূর্ব্ববঙ্গের ছেলেগুলিকে বলিতে গেলেই তাহারা চোখ পাকাইয়া চড়া গলায় বলিয়া উঠিবে, আমাগর কি আবশ্যক? ডাক্কা মেইল নাই? গোয়ালন্দ ইষ্টিমার নাই?

কিন্তু বছর দেড় পরে প্রেমের দেবতা বোধ করি প্রসন্ন হইলেন। মনোজ দিন কয়েক হইল আমহার্স্ট স্ট্রীটে একটা মেসে উঠিয়া আসিয়াছে। তাহার চোখে পড়িল, প্রতিদিন বেলা সাড়ে নয়টার সময়ে সামনে একটি গলির মুখে মেয়ে-স্কুলের বাস আসিয়া দাঁড়ায়। একটি বছর সতরো বয়সের মেয়ে বেণী দোলাইয়া বইগুলি বুকে চাপিয়া ধরিয়া সহপাঠিনীদের দিকে তাকাইয়া হাসিতে হাসিতে গাড়িতে উঠে। দূর হইতে যতটা বুঝা যায়, মেয়েটির গায়ের রঙ খুব ফর্সা নয়, উজ্জ্বল শ্যাম; গঠন লম্বা ছিপছিপে; মুখ চোখ নাক ভালই, অন্তত চলনসই। মনোজ এইখানেই একবার শেষ চেষ্টা করিবে, স্থির করিল।

রবিবার (কারণ সেই দিন মেয়েটির স্কুল থাকে না) সকাল নয়টার সময়ে মনে মনে বাংলা দেশের খ্যাতনামা প্রেমিকদের নাম জপ করিতে করিতে মনোজ সেই গলিতে প্রবেশ করিল। গলির মুখেই একটি বড় দোতলা বাড়ি, তাহার সদর-দরজা বড় রাস্তার উপরে। এই বাড়ির পরেই একটি ছোট দোতলা বাড়ি। বাড়ির সদর-দরজা বন্ধ। খোলা জানালার মাথায় একটি সাইন-বোর্ড, তাহাতে লেখা, হ্যানিমান হোমিও

হল, ডাঃ রাঘবচন্দ্র বোস, এইচ. এম. ডি. (ফিল)। অর্থাৎ ডিগ্রীটি স্বদেশী সস্তা মাল নহে, বিদেশ হইতে বহুমূল্যে সংগৃহীত হইয়াছে। মনোজের মন ও বুদ্ধি দুইই একযোগে রায় দিল, মেয়েটি এই বাড়িরই। কিন্তু বাড়িতে ঢুকিবে কি উপায়ে? জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া ঘরের মধ্যে কাহাকেও দেখা গেল না। মনোজ কি ডাক্তারের উদ্দেশে দরজায় ধাক্কা দিবে? হঠাৎ পিছন হইতে বাজখাঁই গলায় 'কি চাই' প্রশ্ন শুনিয়া মনোজ চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিল, তাহার চেয়েও প্রায় এক হাত লম্বা একজন লোক বুক চিতাইয়া, ঠোঁট দুইটা চাপিয়া, কোটরে-ঢোকা ছোট ছোট চোখ দুইটার ধারালো দৃষ্টি তাহার উপর উদ্যত করিয়া, দাঁড়াইয়া আছে। লোকটার মাথাটা শরীরের অনুপাতে ছোট। ঘোড়া প্যাটার্নের লম্বা মুখ, উঁচু চোয়াল, বসা গাল, সারা মুখটা ব্রণ ও মেচেতায় ভর্তি, বুকটা চ্যাপ্টা, পাঁজরের হাড়গুলা এক-একটি করিয়া গোনা যায়, হাত দুইটা আজানুলম্বিত বলা চলে, মাথার চুল ছোট ছোট করিয়া ছাঁটা, মুখে দাড়ি ও গোঁফ নাই বলিলেই হয়, পরিধানে খাটো কাপড় মালকোঁচা করিয়া পরা, গা ও পা দুইই খালি। লোকটার বয়স তেইশ-চব্বিশের বেশি হইবে না। মনোজ কোনমতে তোতলাইয়া কহিল, ডা—ডা—ডাক্তার—

ওঃ, রোগী।—বলিয়া লোকটা পাঁজাকোলা করিয়া মনোজকে একেবারে ডাক্তারখানায় ঢুকাইয়া একটা চেয়ারে বসাইয়া দিয়া কহিল, বসুন, ডাক্তারবাবু আসছেন।—বলিয়া দেওয়ালে ঝোলানো একটা মলিন রঙ-চটা পর্দার অন্তরালে অন্তর্হিত হইল।

অভ্যর্থনার বহর দেখিয়া মনোজ ঘাবড়াইয়া গেল। ডাক্তার, না ডাকাতের সর্দার, কে জানে! মনোজ চারিদিকে সশঙ্ক দৃষ্টি ফেলিয়া ফেলিয়া প্রকৃত অবস্থাটা বুঝিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কক্ষটি দৈর্ঘ্যে

ও প্রস্থে সাত-আট হাতের বেশি হইবে না। এক পাশে দেওয়াল ঘেঁষিয়া দুইটা লম্বা ও সরু কাচের দরজাওয়ালা আলমারি। একটির মধ্যে কলেজের গ্যালারিতে যেমন ভাবে ছাত্রেরা বসে, তেমনই ভাবে ছোট ছোট হোমিওপ্যাথি ঔষধের শিশি সাজানো রহিয়াছে। আর একটির মধ্যে রহিয়াছে মোটা মোটা বই। ঔষধের আলমারির পাশে কোণের কাছে একটি টুল; তাহার উপর একটি কলাই-করা গামলা; তাহার কিঞ্চিৎ উপরে একটি জলের ট্যাপ; ট্যাপের গলদেশ হইতে একটি তোয়ালে ঝুলিতেছে। মনোজের সামনেই একটি ছোট টেবিল, অয়েল-ক্লথ দিয়া ঢাকা। তাহার উপর জলের বোতল, ওজন করিবার নিক্তি, ছোট চামচ, কাঁচি, অয়েল-পেপার প্রভৃতি ডাক্তারের আবশ্যকীয় দ্রব্য সাজানো রহিয়াছে। টেবিলের ও পাশে একটা ঈজি-চেয়ার, তেল ও ধূলা বসিয়া তাহার আসল বাদামী রঙ কালো হইয়া উঠিয়াছে, ছাউনির উপরও কালো রঙের ছোপ পড়িয়াছে। ঈজি-চেয়ারের পাশেই একটি তেপায়ার উপর খান দুই মোটা মোটা বই ও একটি চশমার খাপ রহিয়াছে। ঈজি-চেয়ার হইতে খাড়া উপরে দেওয়ালের গায়ে কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো হ্যানিমান সাহেবের একটি বড় ছবি টাঙানো রহিয়াছে। ছবির নীচে পেরেক হইতে একটি ফুলের মালা ঝুলিতেছে, ফুলগুলি শুষ্ক ও বিবর্ণ। রোগীদের বসিবার জন্য আরও দুইটি চেয়ার ও একটি বেঞ্চি রহিয়াছে।

সাজ-সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র দেখিয়া মনোজের মন অনেকটা শান্ত হইল। ডাক্তারখানাই বটে। ওই লোকটি নিশ্চয়ই ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার, ডাক্তারকে খবর দিতে ভিতরে গিয়াছে। কিন্তু যে ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার সাক্ষাৎ যমদূত, তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকা সুবুদ্ধিসঙ্গত হইবে কি? এমনিই তো কম্পাউণ্ডারের কবলস্থ হইয়া

তাহার অবস্থা কাহিল হইয়া উঠিয়াছে, ইহার উপর স্বয়ং ডাক্তারের হাতে পড়িলে বোধ করি হাঁটিয়া বাড়ি ফিরিতে হইবে না। মনোজ উঠিয়া পড়িবার উপক্রম করিল। কিন্তু পুরাপুরি উঠিবার পূর্ব্বেই পর্দ্দা ঠেলিয়া ডাক্তার ও কম্পাউণ্ডারের যুগল মূর্ত্তি একসঙ্গে ঘরে ঢুকিল। ডাক্তারের ডান হাতে লাঠি, বাম হাত কম্পাউণ্ডারের ঘাড়ের উপরে, মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন। কম্পাউণ্ডার ঈষৎ নুইয়া দুই হাত দিয়া পিছন দিক হইতে ডাক্তারকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। ডাক্তার খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া ঘরে ঢুকিয়া একবার সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন এবং চারিদিকে চাহিয়া কহিলেন, বাবা বিশু, ঘরটা বড় অগোছালো হয়ে আছে, আজ একটু ঝাড়াঝাড়ি ক'রো।—বলিয়া ঈজি-চেয়ারটার সামনে আসিয়া হ্যানিমান সাহেবের উদ্দেশ্যে যুক্তহস্তে প্রণাম করিলেন। তারপর ঈজি-চেয়ারে চিত হইয়া শুইয়া পড়িলেন। বিশু পর্দ্দার অন্তরালে পুনরায় অন্তর্হিত হইল।

রাঘববাবুর বয়স পঞ্চাশ পার হইয়া গিয়াছে। বেঁটে ও কৃশ দেহ; অস্থিসার শীর্ণ মুখ; গোঁফ ও দাড়ি পরিষ্কার করিয়া চাঁছা; গালের উপর একটি আঁচিল, তাহার উপরে কয়েকগাছি চুল খাড়া হইয়া আছে; চোখের কোণ ও সারা কপাল কুঞ্চনরেখাকীর্ণ; দৃষ্টি ক্লান্ত ও করুণ; মাথায় বড় বড় কাঁচা ও পাকা চুল; গায়ে গলাবন্ধ সাদা জিনের কোট। রাঘববাবু সরকারী চাকুরি করিতেন। বাতের আক্রমণে দেহ বিকল হইয়া পড়ায় বৎসর দুই পূর্ব্বে পেন্‌শন লইতে বাধ্য হন। ম্যালেরিয়ার ভয়ে গ্রামে ফিরিতে সাহস করিলেন না; কলিকাতায় একটি ছোট বাড়ি ভাড়া করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। সংসারে প্রতিপাল্যের সংখ্যা বেশি ছিল না। পত্নী আগেই স্বর্গীয়া হইয়াছিলেন। সন্তানদের মধ্যে একটি মাত্র কন্যা ছাড়া বাকিগুলি পত্নীর আগেই বিদায় লইয়াছিল।

আর ছিল দূরসম্পর্কের এক ভাগিনেয় এবং গ্রামের এক অনাথা কায়স্থ বিধবা। কাজেই পেন্‌শন বাবদ যাহা পাইতেন, তাহাতেই সংসার এক রকম করিয়া চলিতে পারিত। তবে কন্যা দিন দিন বিবাহযোগ্যা হইয়া উঠিতেছিল। অতএব কিঞ্চিৎ আয়বৃদ্ধির জন্য হোমিওপ্যাথি প্র্যাক্‌টিস করা স্থির করিলেন। চাকুরি-জীবনেই এই বিদ্যা কিঞ্চিৎ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাহাই পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জ্জিত করিয়া লইলেন এবং ডিগ্রী, ঔষধপত্র, আলমারি ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করিয়া নিজের বৈঠকখানায় ডিস্‌পেন্সারি বসাইলেন।

কিছুক্ষণ পরে খাড়া হইয়া বসিয়া রাঘববাবু মনোজকে কহিলেন, কি হয়েছে আপনার? মনোজ এতক্ষণ তাহাই ভাবিতেছিল। কি রোগ বলিলে ডাক্তারের কাছে ধরা পড়িবার ভয় থাকিবে না, অথচ অনেক দিন ধরিয়া চিকিৎসা চলিতে পারিবে, তাহাই স্থির করিতেছিল। কিন্তু কোনটাই পছন্দসই হইতেছিল না। জ্বর? নাড়ি দেখিলেই ধরা পড়িবে। পেটের অসুখ? দুই-চার ডোজ ওষুধ খাইলেই সারিয়া উঠিতে হইবে। বুক-ধড়ফড়ানি? যদি যাওয়া-আসা বন্ধ করিয়া দেয়? মনোজ জবাব দিল, মাথা টনটন করে।

ডাক্তার প্রশ্ন করিলেন, কতদিন থেকে হয়েছে?

বছর খানেক।

কোন্‌খানটা টনটন করে?

মনোজ ডান হাত মাথায় বুলাইয়া কহিল, সবটাই।

চোখ ছোট ও কপাল কুঞ্চিত করিয়া ডাক্তার কহিলেন, সবটাই? কোন্ দিকটায় বেশি?

মনোজ কহিল, ডান দিকটা।

বেশ। টনটন করে, না ঝনঝন করে—ঠিক ক'রে বলুন তো?

মনোজ বোকার মত কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া কহিল, ঝনঝন করে।

ডাক্তার সন্তোষের সহিত ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, আচ্ছা। তাই বলুন। দিন-রাতের মধ্যে কখন বেশি হয়?

দিনের বেলায় বেশি হয়।

তা তো হবেই। সকালে, দুপুরে আর সন্ধ্যার মধ্যে কখন বেশি হয়?

মনোজ বুদ্ধি খাটাইয়া কহিল, দুপুরে বেশি হয়।

শুলে বেশি হয়, না উঠলে বেশি হয়?

উঠলে বেশি হয়।

শীতকালে বাড়ে, না গ্রীষ্মকালে বাড়ে?

গ্রীষ্মকালে।

ঠাণ্ডা ভাল লাগে, না গরম ভাল লাগে?

ঠাণ্ডা ভাল লাগে।

অঙ্গুলির ইঙ্গিতে মনোজকে ডাকিয়া রাঘববাবু কহিলেন, এখানে এস—আসুন।

মনোজ কাছে গেল। রাঘববাবু কহিলেন, বসুন। মনোজ মেঝের উপর উবু হইয়া বসিল।

রাঘববাবু আঙুল দিয়া মাথাটি টিপিতে টিপিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, সোয়াস্তি হচ্ছে?

মনোজ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হ্যাঁ।

মুখটা তুলুন দিকি!

মনোজ মুখ তুলিতেই রাঘববাবু তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সহযোগে মনোজের চোখ দুইটি একে একে প্রসারিত করিয়া কহিলেন, চোখে ভাল দেখতে পান?

মনোজ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না, ঝাপসা দেখি।

দেখি কানটা।—বলিয়া কানের পাতায় টান দিয়া ভিতরটা দেখিয়া রাঘববাবু প্রশ্ন করিলেন, কানে পুঁজ আছে নাকি?

মনোজ প্রবল বেগে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না।

আচ্ছা। ভয় নেই, ভাল হয়ে যাবেন; বসুনগে।

এমন সময়ে বিশু আসিয়া দাঁড়াইল। রাঘববাবু তাহাকে বলিলেন, ওষুধের ব্যাগটা নিয়ে এস দিকি!

ঔষধ তৈয়ারি করিয়া শিশিতে লেবেল ও দাগ আঁটিতে আঁটিতে রাঘববাবু প্রশ্ন করিলেন, কি করা হয়? চাকরি?

মনোজ কহিল, আজ্ঞে না, পড়াশুনা করি।

ছাত্র! তা হ'লে পুরো ফী দিতে হবে না, আদ্ধেক দিলেই হবে।

মনোজ বিনীতভাবে প্রশ্ন করিল, কত লাগবে তা হ'লে?

গম্ভীরভাবে রাঘববাবু কহিলেন, ফী চার টাকা আর ওষুধের দাম এক টাকা, মোট পাঁচ টাকা।—বলিয়া ঔষধের শিশি বিশুর হাতে দিয়া মনোজকে দিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। বিশু শিশি-হস্তে ডবল মার্চ করিয়া মনোজের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল ও শিশিটা তাহার হাতে গুঁজিয়া দিয়া দক্ষিণ করতল প্রসারিত করিয়া কহিল, টাকা?

মনোজ আমতা আমতা করিয়া রাঘববাবুর উদ্দেশ্যে কহিল, একটু কম হ'লে হয় না!

রাঘববাবু কোমল কণ্ঠে কহিলেন, কমই তো ক'রে দিয়েছি বাবা।

মানে, অনেক দিন ধ'রে চিকিচ্ছে করাতে হবে কিনা!

বেশ, পরে কিছু সুবিধে ক'রে দোব।

মনোজ ইতস্তত করিয়া বুক-পকেট হইতে মানিব্যাগটি বাহির করিয়া খুলিয়া উঁকি মারিয়া দেখিয়া কহিল, খুচরো নেই, দশ টাকার নোট আছে।

তাই নাকি? দেখি।—বলিয়া বিশু টুক করিয়া নোটটি তুলিয়া লইয়া বার দুই ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া কহিল, ভাঙিয়ে আনছি।—বলিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। মনোজ তড়াক করিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, নিয়ে পালাল নাকি?

রাঘববাবু মৃদু হাসিয়া কহিলেন, না। এখনই আসবে, বসুন।—বলিয়া একটি মোটা বই টানিয়া লইয়া তাহাতে দৃষ্টি-সংযোগ করিলেন। মনোজ চুপ করিয়া বসিয়া দরজার দিকে ঘন ঘন তাকাইতে তাকাইতে নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগিল। হায় হায়! তাহার অদৃষ্টে প্রেম নাই। না হইলে দশ-দশটা টাকা হাতছাড়া হইয়া গেল, অথচ যে তরুণীর মুখের হাসি ও চোখের চাহনি কাঁটার মত মনের কানাসিতে বিঁধিয়া তাহাকে সশরীরে টানিয়া আনিয়াছে, তাহার দেখা মিলিল না! সে কি এই বাড়িতেই আছে? থাকিলে একবারও কি তাহার মনে হইতেছে, তাহাকে একটি বার দেখিবার জন্য মাত্র কয়েক গজ দূরে, একজন হতভাগ্য কিরূপ ছটফট করিতেছে? যদি তাহা হইত, তবে হয়তো ওই ছেঁড়া পর্দার ফাঁক দিয়া—

এমন সময়ে পদশব্দ শুনিয়া দরজার দিকে তাকাইতেই মনোজ দেখিল বিশু প্রবেশ করিতেছে, ডান হাতের বদ্ধমুষ্টি বুকের উপর চাপিয়া ধরা, বাম হাতে একটা শালপাতার ঠোঙা। মনোজের কাছে আসিয়া কহিল, ধরুন।

মনোজ একটু ইতস্তত করিতেই ধমকাইয়া কহিল, ধরুন না!

মনোজ হাত বাড়াইতেই ঠোঙাটা ধরাইয়া দিয়া সটান টেবিলের কাছে গিয়া দাঁড়াইল এবং টাকা, আনি, দুয়ানি ইত্যাদি টেবিলে নামাইয়া গনিতে লাগিল।

মনোজ কহিল, কি করতে হবে?

বিশু গম্ভীরভাবে কহিল, খান।

মনোজ বিস্ময়ের সহিত কহিল, সে কি ?

ঠোঙাতে কতকগুলা জিলাপি। মনোজ কহিল, এগুলো আনলেন কেন ?

বিশু কড়া গলায় কহিল, আনলেন কেন! না আনলে আমাকে ভাঙানি দিত কিনা! আমার পৈতৃক পেরজা যে! আনলেন কেন! নিজে গেলেই পারতেন।

রাঘববাবু কহিলেন, উনি তো অন্যায় কিছু বলেন নি। ওঁকে অমন করছ কেন? সত্যি তো, উনি ওগুলো নিয়ে কি করবেন? একে অসুস্থ শরীর। তুমি বরং ওগুলো বাড়ির ভেতর নিয়ে যাও আর দামটা ওঁকে দিয়ে দাও।

মনোজ লজ্জিতভাবে বিশুকে কহিল, এগুলো বাড়ির ভেতরেই নিয়ে যান। আমি নিয়ে কি করব, বলুন? দাম দিতে হবে কেন—সামান্য জিনিস, ছিঃ ছিঃ!

বেশ তো, ভালই তো।—বলিয়া বিশু এক লাফে কাছে আসিয়া, ঠোঙাটা ছিনাইয়া লইয়া, তিন লাফে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সেই দিনই বেলা তিনটার সময়ে মনোজ আবার রাঘববাবুর ডিস্‌পেন্সারির সামনে আসিয়া হাজির হইল। দরজা জানালা দুইই বন্ধ। অতএব উপায়? মনোজ 'ডাক্তারবাবু' বলিয়া বার দুই হাঁক দিতেই দোতলার খোলা জানালা হইতে মিহি মেয়েলী গলায় প্রশ্ন হইল, কে? মনোজ দুই পা পিছাইয়া আসিয়া উপর দিকে তাকাইতেই দেখিল, একজন তরুণী; খুব সম্ভব তিনি, যিনি দূর হইতে হাস্যশর হানিয়া তাহার মনকে কাবু করিয়াছেন। মনোজের বুকের মধ্যে তাণ্ডব-নৃত্য শুরু হইল ও গলাটা শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেল। কোনমতে ঢোক গিলিয়া কহিল, আমি, মানে রোগী।

তরুণী কহিল, একটু দাঁড়ান, বিশুদাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।—বলিয়া সরিয়া গেল। মনোজ দরজার সামনে আসিয়া বড় সাহেবের আফিস-কামরায় চাকুরি-প্রত্যাশী বেকার যুবকের মত মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

হঠাৎ খুক করিয়া কাসির শব্দ। মেয়েলী গলার কাসি! তবে কি তরুণী নিজে দরজা খুলিতে আসিয়াছে? প্রেমার্ত্ত হৃদয়ের করুণ ক্রন্দন কি কানে তথা প্রাণে পৌঁছিয়াছে? মহিমার উর্দ্ধলোক হইতে নামিয়া আসিয়া মহিমময়ী নিজে হাত ধরিয়া অধমকে মর্ত্ত্যের সীমানা পার করিয়া লইতে আসিয়াছে? খুট করিয়া শব্দ করিয়া দরজা খুলিয়া গেল। মনোজ বিস্ফারিত নয়নে দেখিল, একজন মেয়েমানুষ, তরুণী নয়, বয়স প্রায় ত্রিশ, মাথায় স্বল্প অবগুণ্ঠন; সীমন্তে সিন্দূর নাই, অথচ চুলে তরঙ্গের আভাস; গায়ের রঙ প্রায় ফর্সা; টেবো টেবো গাল; নাকটি একটু খাঁদা; চোখ ছোট ও গোল; পুরুষের মত মোটা ভ্রূ; চোখে কৌতুকের দৃষ্টি হানিয়া, ঠোঁটে মিষ্ট হাসি টানিয়া, মিহি গলায় বিনাইয়া বিনাইয়া কহিল, আসুন, বিশুবাবু ঘুমুচ্ছে, দিদিমণি আপনাকে বসতে বললেন।—বলিয়া লজ্জার অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার জন্য গায়ের কাপড় এদিকে ওদিকে টানিয়া পিছন ফিরিয়া সটান অন্দরে চলিয়া গেল। মনোজ ফ্যালফ্যাল করিয়া কিছুক্ষণ তাকাইয়া রহিল। তারপর একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ডিস্‌পেন্সারিতে আসিয়া বসিল।

কিছুক্ষণ পরেই পাশের ঘরে মেয়েমানুষের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, ও বিশুবাবু, ওঠ না, ওঠ না গো!

বিশুবাবুর কর্ণকুহরে কণ্ঠস্বর বোধ করি পৌঁছিল না। স্বর উঁচু পর্দ্দায় ডাকিল, শুনছ, ও বিশুবাবু! ওঠ না!

এবার শ্লেষ্মাজড়িত কণ্ঠের উত্তর শোনা গেল, না।

না কি গো! ভদ্দরনোক ব'সে রয়েছে। আরও উচু পর্দ্দায়, ও দিদিমণি, উঠছে না বিশুবাবু।

দোতলা হইতে বোধ করি দিদিমণি আদেশ দিলেন, কানে জল ঢেলে দাও।

আবার নারীকণ্ঠ মিনতি করিয়া কহিল, কানে জল ঢেলে দোব, ওঠ বলছি।

বিশু বীরসুলভ কণ্ঠে কহিল, দিয়ে দেখ না মজা।

নারীকণ্ঠ আবদারের সুরে কহিল, বা রে! আমি কি করব? দিদিমণি বলছে যে!

অনতিবিলম্বে দিদিমণির আবির্ভাব ঘটিল; তীক্ষ্নস্বরে কহিল, তুমি নিজের কাজ করগে, ওকে উঠিয়ে কাজ নেই।

বিশু বোধ করি উঠিয়া বসিল, মোলায়েম কণ্ঠে কহিল, আমি জেগেছি তো, এমনিই প'ড়ে ছিলাম।

বেশ করেছিলে।—দিদিমণি বিরক্ত স্বরে কহিল।

মনোজ কান পাতিয়া শুনিতেছিল এবং দিদিমণির আবির্ভাব বুঝিতে পারিবামাত্র চেয়ারটা সরাইয়া, ঘাড় বাঁকাইয়া, পর্দ্দার ফাঁক দিয়া দেখিবার চেষ্টা করিতেছিল। হঠাৎ পর্দ্দাটা পিছন হইতে ঠেলা পাইয়া সামনের দিকে সরিয়া আসিতেই ভাবিল, বোধ হয় বিশুর প্রবেশ ঘটিবে। অতএব হ্যানিমান সাহেবের দিকে তাকাইয়া তন্ময় হইয়া কর্ণপটহকে বিশ্বম্ভরের বজ্রনাদের জন্য প্রস্তুত করিল। অনতিবিলম্বে বজ্রনাদ না হইয়া বীণাধ্বনি হইল, নমস্কার। মনোজ চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিল, তাহার মানসী প্রিয়া দুই হাত দূরে দাঁড়াইয়া। তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া কহিল, নমস্কার।

তরুণী সপ্রতিভ কণ্ঠে কহিল, বাবা তো এখন নীচে নামবেন না।

মনোজ মনে মনে কহিল, নাই বা নামিলেন, তুমি তো নামিয়াছ। এখন দয়া করিয়া কয়েক পা আগাইয়া আসিয়া এই তৃষিত বক্ষে—

প্রশ্ন হইল, আপনার কি বিশেষ দরকার?

মনোজ মাথা চুলকাইয়া কহিল, বিশেষ, মানে, ওবেলায় আমি এসেছিলাম। রোগ দেখিয়েছি। একটুখানি জানবার আছে।

বলুন, কি জানতে চান? আমি বাবাকে জিজ্ঞেস ক'রে এসে ব'লে দিচ্ছি।

মনোজ চিন্তিত মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। কি বলিবে? বলিবে কি, তোমার বাবার কাছে কিছুই জানিবার নাই, আমার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর একমাত্র তোমারই কাছে আছে? তুমিই আমার—

তাগিদ আসিল, বলুন?

মনোজ ঘাবড়াইয়া গিয়া কহিল, বলছি এই যে, কি খাব?

আমি জিজ্ঞেস ক'রে আসছি, আপনি বসুন।—বলিয়া তরুণী ত্বরিত পদে প্রস্থান করিল। মনোজ বসিল না; খাড়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিল। হায় হায়! নির্ব্বোধের মত সুবর্ণ-সুযোগ হেলায় হারাইলাম! আর হয়তো আসিবে না। হয় সেই বিড়ালচোখী বিধবাটিকে পাঠাইয়া দিবে, নয় বিশ্বম্ভরকে; এবং তাহাদের মারফৎ খাদ্য ও পানীয়ের ফিরিস্তি শুনিয়া বাড়ি ফিরিতে হইবে। কিন্তু যে কথা বলিবার জন্য আজ দিন পাঁচ-ছয় সমস্ত অন্তরাত্মা ছটফট করিতেছে, সেই কথাটাই বলিতে বাকি রহিল। কলিকাতার ছেলে হইলে কি এমন করিত? হয়তো বিনাইয়া বিনাইয়া রসাইয়া রসাইয়া এই সুযোগে প্রেমের পিটিশন দাখিল করিয়া ফেলিত। হয়তো হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া প্রেমিকসুলভ পোজে বলিত, আমার রোগ মাথার নহে, বুকের; সে রোগ তোমার বাবার হোমিওপ্যাথিতে সারিবে না।

তারপর প্রিয়ার পুষ্পপেলব হাতখানি চট করিয়া ধরিয়া বুকে চাপিয়া বলিত, সে রোগের একমাত্র ঔষধ তোমার হাতের স্পর্শ।

বিশু দুই হাত দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে প্রবেশ করিয়া গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, ওঃ, আপনি! আমি বলি আর কেউ।—বলিয়া একটা চেয়ারে উবু হইয়া বসিয়া বার কয়েক হাই তুলিয়া, গা-মোড়া ভাঙিয়া কহিল, একটু নিশ্চিন্তি হয়ে ঘুমুবার জো নেই।—বলিয়া হাত পাতিয়া কহিল, একটা বিড়ি দ্যান দিকি!

মনোজ কহিল, বিড়ি তো খাই না।

কি খান তা হ'লে? সিগারেট?

হুঁ, কিন্তু সঙ্গে তো নেই।

মনোজের কণ্ঠস্বর নকল করিয়া বিশু কহিল, সঙ্গে তো নেই! তবে তো কেতাত্থ হয়ে গেলাম। সঙ্গে তো পয়সা আছে?—বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মনোজ বাম বাহু দিয়া বুক-পকেট চাপিয়া ধরিল, পাছে সকাল-বেলার মত ছিনাইয়া লয়। এবেলা অবশ্য মানিব্যাগে বিশেষ কিছু ছিল না; তবু যাহা ছিল, তাহাও বিশুর হাতে নিশ্চিন্ত হইয়া দেওয়া যায় না।

বিশ্বম্ভর কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, দেখি একটা সিকি।

যাক, চাহিদা চার আনায় নামিয়াছে। মনোজ ডান হাত পকেটে ঢুকাইয়া মানিব্যাগ হইতে একটি দুয়ানি বাহির করিয়া বিশুর হাতে দিল। বিশু দুয়ানিটি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া কহিল, মাত্র দোয়ানি! ভারী কেপ্পন লোক তো আপনি! যাকগে, এতেই হবে এক রকম ক'রে।—বলিয়া নিজের মনে হিসাব করিতে লাগিল, এক বাণ্ডিল বিড়ি, একটা দেশলাই, দোক্তা এক প্যাকেট হৈমীর জন্যে—

মনোজ বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, হৈমী কে?

বিশু খ্যাক করিয়া উঠিল, হৈমী কে! তাও আপনাকে বলতে

হবে নাকি ? একটা দোয়ানি দিয়ে এমন কিছু মাথা কিনে রাখেন নি !—বলিয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইয়া আদেশের স্বরে কহিল, আমি না আসা পর্য্যন্ত ব'সে থাকবেন।

মনোজের মন খুঁতখুঁত করিতে লাগিল। ওই মেয়েটির নাম হৈমী নাকি ? দিন এক প্যাকেট করিয়া দোক্তা খায় এবং সেই দোক্তার যোগান দেয় বিশ্বম্ভর, এমনই করিয়া রোগীর পকেট মারিয়া ? ওবেলায় জিলাপির ঠোঙা বোধ হয় হৈমবতীর ভোগের জন্য আসিয়াছিল। রাঘববাবু কি বিশুকে জামাই করিবার জন্য জিয়াইয়া রাখিয়াছেন নাকি ? তাহা হইলে তো বেশ কথা ! প্রেমের প্রতিযোগিতায়, আর যাহারই হউক, বিশুর প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়া নিরাপদ নয়।

তরুণী প্রবেশ করিল। মনোজ উঠিয়া দাঁড়াইল।

তরুণী কহিল, বাবা বললেন, আপনি মাছ মাংস খাবেন না, লঙ্কা খাবেন না।

মনোজ কহিল, আচ্ছা।

আর মিষ্টি খাবেন না।

মনোজ কহিল, বেশ। কিন্তু জিলিপি ?

তরুণী ফিক করিয়া হাসিয়া কহিল, জিলিপি বুঝি মিষ্টি নয় ?

চোখে চোখ মিলাইয়া মনোজ হৃদয়দ্রাবী হাস্য করিল।

তরুণী প্রশ্ন করিল, আপনি বুঝি জিলিপি খেতে ভালবাসেন ?

করুণ মুখে মনোজ কহিল, হুঁ।

তরুণী মৃদু হাসিয়া কহিল, কি করবেন বলুন, যতদিন না সেরে উঠছেন, একটু সাবধানে থাকবেন। কিন্তু বিশুদাদা এখানে ছিল না ?

মনোজ জবাব দিল, ছিলেন তো, এখনই কোথায় গেলেন, কিন্তু—আপনিও তো জিলিপি খেতে ভালবাসেন।

তরুণী মুখ চোখ লাল করিয়া নীরস কণ্ঠে কহিল, না। আচ্ছা, নমস্কার। দয়া ক'রে বিশুদাদা আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করবেন।—বলিয়া পর্দ্দার অন্তরালে অন্তর্দ্ধান করিল।

সেই দিন মেসে ফিরিয়া মনোজ বন্ধুদের টানা-হেঁচড়া সত্ত্বেও সিনেমায় গেল না, ভাতের বদলে কড়কড়ে রুটি খাইল, রাত্রি নয়টা বাজিতে না বাজিতে দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল এবং সারারাত্রি ছটফট করিয়া ভোরের দিকে ঘুমাইয়া পড়িয়া স্বপ্ন দেখিল, বিশু তাহার পকেট মারিয়া ছুটিতেছে, সে কিন্তু কিছুতেই দৌড়াইতে পারিতেছে না; বিধবাটি কাছে দাঁড়াইয়া ফিক ফিক করিয়া হাসিতেছে।

আর রাঘবনন্দিনী? সে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত রাঘবের পায়ে মালিশ করিল এবং রাত্রি একটা পর্য্যন্ত জানালার ধারে দাঁড়াইয়া অদূরবর্ত্তী ডাস্টবিন ও পচা নর্দ্দমার গন্ধ শুঁকিতে শুঁকিতে আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল, যথা—লোকটির চেহারাটি বেশ; হাসিটি ভারি মিষ্টি; একবার চোখোচোখি হইলে বুকের ভিতরটা কেমন সিরসির করিয়া উঠিয়াছিল। বিশুদাদা যেন কি? হৈমী অত্যন্ত বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছে। লোকটির কি নাম, কে জানে! বাবা জানেন বোধ হয়। এই বয়সে রোগে ভুগিতেছে, সেইজন্যই বোধ হয় মুখটি শুকাইয়া গিয়াছে; বাবার ঔষধে নিশ্চয় ভাল হইবে; বাবার ঔষধে বাবার নিজের রোগ কিন্তু সারে না, সেই ডাক্তারী মালিশ আনিতেই হয়। বিশুদাদার কোন কাণ্ডজ্ঞান নাই, হৈমীকে রান্নাঘরে দিনদুপুরে জিলাপি খাওয়ায়। লোকটি কাল আবার আসিবে কি না, কে জানে! ইত্যাদি। তারপর ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিল, লোকটি এক ঠোঙা জিলাপি তাহার সামনে ধরিয়া খাইবার জন্য সাধাসাধি করিতেছে, সে কিন্তু কিছুতেই হাত বাড়াইয়া খাইতে পারিতেছে না।

পরদিন বেলা নয়টা বাজিতে না বাজিতে মনোজ রাস্তায় আসিয়া পায়চারি করিতে লাগিল। তারপর, মেয়ে-স্কুলের গাড়িটাকে আসিতে দেখিয়া গলিতে ঢুকিয়া পড়িল। একটু যাইতেই দেখিল, রাঘববাবুর মেয়ে স্কুলে যাইবার জন্য বাহির হইয়াছে। মনোজ কহিল, নমস্কার। মেয়েটিও মৃদু হাসিয়া নমস্কার করিল। মনোজ জিজ্ঞাসা করিল, আপনার বাবা নেমেছেন? মেয়েটি একবার তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া মুখ নামাইল এবং লজ্জারক্ত মুখে জবাব দিল, হ্যাঁ।

মনোজ ডিস্‌পেন্সারিতে যাইয়া দেখিল, রাঘববাবু ঈজি-চেয়ারে চিত হইয়া শুইয়া বই পড়িতেছেন। মনোজকে দেখিয়া উঠিয়া বসিলেন এবং বইটি পাশের তেপায়ার উপর রাখিয়া কহিলেন, বসুন, কেমন আছেন আজ? মনোজ চেয়ারে বসিয়া বিনীতভাবে কহিল, খুব ভাল আছি; কিন্তু আপনি আমাকে 'আপনি' ব'লে লজ্জা দেবেন না। আপনার ছেলের বয়সী আমি—

রাঘববাবু প্রীত হইয়া কহিলেন, সত্যিই তো। আমার বড় ছেলে বেঁচে থাকলে—। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, তোমার বয়সীই হ'ত। ধর না, আমার সুধাই তো বোধ হয় সতরোয় পা দিয়েছে।

মনোজ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল, মেয়েটির নাম তাহা হইলে হৈমী নয়, সুধা।

রাঘববাবু কহিলেন, বাবাজীর নামটি কি?

মনোজ নিজের পুরা নাম বলিল। রাঘববাবু পুলকিত হইয়া কহিলেন, মিত্র? একেবারে স্বজাতি, স্বঘর—তা হ'লে বাবা, তোমার কাছে ফীটা নেওয়া আমার উচিত হয় নি।

মনোজ কহিল, সে কি! এই আপনার ব্যবসা—

রাঘববাবু কহিলেন, ব্যবসা ঠিক নয়, রিক্রিয়েশন বলতে পার।

সরকারী চাকরি করতাম, হঠাৎ হ'ল বাত; অকর্ম্মণ্য ক'রে দিলে; কাজেই পেন্‌শন নিয়ে চ'লে আসতে হ'ল। কাজের মানুষ, রাতদিন কাজ নিয়ে থাকতাম। কাজেই একটা কিছু ক'রে সময় কাটাবার জন্যেই হোমিওপ্যাথি ধরলাম। যাকগে, যা দিয়েছ, দিয়েছ; আর তোমার কিছু লাগবে না।

একটু চুপ করিয়া ভাবিয়া কহিলেন, তোমার বাবার নামটি?

মনোজ কহিল, ঘনশ্যাম মিত্র।

কি করেন?

উকিল।

বেশ বেশ। তোমার আর ভাই বোন আছে তো?

ভাই আর নেই, বোন আছে একটি; তাও তার বিয়ে হয়ে গেছে। মা একেবারে একলা—

আমারও তো তাই। একটি মাত্র মেয়ে, আর তিন কুলে কেউ নেই। বিশু, দূরসম্পর্কের এক বোনের ছেলে, মা বাবা নেই, ছোট থেকেই আমার কাছে আছে। ভেবেছিলাম, মানুষ ক'রে দোব; তা মানুষ না হয়ে দিন দিন জানোয়ার ব'নে যাচ্ছে। তাই ভাবি, যদি বেঁচে থাকতেই মেয়েটাকে একটি ভাল ছেলের হাতে দিতে পারি, তবেই ভাল; না হ'লে ওর কি যে হবে, তা ভাবতেও আমার ভয় হয়।—বলিয়া মুখ চিন্তাকুল করিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন।

মনোজ সান্ত্বনা দিয়া কহিল, আপনার একমাত্র মেয়ে, একটু চেষ্টা করলেই ভাল ছেলে পেয়ে যাবেন। দেখুন না, আমার একমাত্র বোন, বাবার অত্যন্ত আদরের, একটু চেষ্টা করতেই বেশ একটি ভাল ছেলে জুটে গেল, এম. এ. পাস ক'রে সাবডেপুটি হয়েছে।

রাঘববাবু মাথাটি লম্বভাবে দোলাইতে দোলাইতে কহিলেন, চেষ্টা

করলেই হবে, কিন্তু আমার তো এই শরীর, চেষ্টা করবে কে ? তা ছাড়া টাকাও আমার নেই।—বলিয়া চোখ হইতে চশমা খুলিয়া কাপড়ের খুঁট দিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া পরিষ্কার করিতে লাগিলেন।

মনোজ কথাটার মোড় ফিরাইবার জন্য কহিল, আপনার ওষুধটা খুব কাজ করেছে। কাল তিনবার খেয়েছি, আজ ব্যথা প্রায় আদ্ধেক ক'মে গেছে।

রাঘববাবু চোখে চশমা পরিয়া, সন্তোষের হাসি হাসিয়া, ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, হোমিওপ্যাথি ওষুধে ও রকম কাজ হয়। তবে ঠিক ওষুধ সিলেক্ট' করা চাই। আরও দুদিন পরে দেখবে, কিছু থাকবে না। তবে স্থায়ী ফল পেতে হ'লে, উচ্চতর শক্তির ওষুধ খেতে হবে। তা তুমি বাবা, দিন একবার ক'রে এসে খবর দিয়ে যেও। ওষুধ আমি দোব, দাম লাগবে না। স্বজাতির ছেলে তুমি, একটু টানাটানি করলে হয়তো সম্পর্কও বেরিয়ে যেতে পারে।

বাড়ি ফিরিবার সময় মোড়ে বিশুর সহিত মনোজের দেখা হইল। ডান হাতে তরকারির ঝুলি, ঝুলির এক পাশ দিয়া এক টুকরা কুমড়া উঁকি মারিতেছে ; ডান হাতে একটা ইলিশ মাছ। দেখিবামাত্র কহিল, আজও গেছলেন ? মনোজ ঘাড় নাড়িয়া স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিল। বিশু কহিল, কিছু দিয়েছেন ? না, ফাঁকি দিয়েছেন ? মনোজ চুপ করিয়া থাকিতেই বিশু কহিল, ওঃ, ফাঁকি দিয়েছেন। জানি আমি। আমি নেই কিনা ! বুড়োর ওই রকমই দাতব্যি। ওদিকে হাঁড়ি চড়ছে শিকেয়। ফী নিয়ে আসবেন, বুঝলেন ?—বলিয়া গটগট করিয়া দুই পা আগাইয়া গিয়া পিছন ফিরিয়া কহিল, কিছু আছে সঙ্গে ? একটা সিকি ? দোয়ানি ? আছে ? দিন তবে, আসুন, কাছে আসুন। মনোজ কাছে গিয়া একটি দুয়ানি বাহির করিয়া দিল, দুয়ানিটি বিশুর জন্যই আনিয়াছিল। বিশু

কহিল, ভারি কঞ্জুস আপনি। কেবল দোয়ানি আর দোয়ানি। ভদ্র-লোকের ছেলেকে সিকির কম দেন কি ক'রে? দুহাত জোড়া দেখতে পাচ্ছেন না? ট্যাকে গুঁজে দিন।

দিন চার পরে একদিন সকালে মনোজ যথাসময়ে রাঘববাবুর বাড়ি গিয়া দেখিল, দরজা বন্ধ। ডিস্‌পেন্সারির জানালাটি খোলা বটে, কিন্তু উঁকি মারিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইল না। বার কয়েক কড়া নাড়িতেই বিশ্বম্ভরের গুরুগম্ভীর আওয়াজ শোনা গেল, কে?

মনোজ জবাব দিল, আমি।

বিশু ধমকাইয়া কহিল, আমি কে?

মনোজ জবাব দিল, আমি—মানে, সেই যে—

ওঃ, দোয়ানিবাবু! দাঁড়ান একটু।

মেয়েলী কণ্ঠস্বর শোনা গেল, দাও না বাবু খুলে!

বিশ্বম্ভর কহিল, দাঁড়া না, আগে জল খাই, গলাটা জ্যাম হয়ে গেছে।—বলিয়া বোধ হয় ঢকঢক করিয়া জল গিলিল। তারপর হুকুম করিল, খুলে দে।

দরজা খুলিতেই মনোজ দেখিল, হৈমবতী, মাথায় তেমনই স্বল্প অবগুণ্ঠন, চোখে কৌতুক, ফিক করিয়া হাসিয়া কহিল, আসুন, দিদিমণি আজ বাড়িতেই। ডিস্‌পেন্সারির চৌকাঠের উপরে বসিয়া বিশুর বোধ করি প্রাতরাশ চলিতেছিল। একটা থালায় কতকগুলা বাসী রুটি, কতকটা গুড়। হৈমীর হাতে জলের গ্লাস। বিশু কহিল, আজ আর মামা নামবেন না, দোয়ানিটি দিয়ে স'রে পড়ুন। মনোজ বিস্ময়ের স্বরে কহিল, কেন? একটা গোটা রুটি মুখে পুরিয়া বিশু বেপরোয়াভাবে চিবাইতে লাগিল, জবাব দিল না।

মনোজ প্রশ্ন করিল, তিনি কি বাড়িতে নেই?

বিশু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, আছেন।

তবে কি শরীর খারাপ? বিশু গলাধঃকরণ সমাপ্ত করিয়া কহিল, দু আনায় এর বেশি খবর দেওয়া চলবে না।

হৈমী আসিয়া কহিল, আচ্ছা কাবলীওয়ালার পাল্লায় পড়েছেন! বাবুর বাতের বেদনাটা বেড়েছে, দিদিমণি সেক দিচ্ছে। হৈমবতীর দিকে চোখ পাকাইয়া তাকাইয়া বিশু কহিল, বললি কেন? মনোজের দিকে তাকাইয়া কহিল, আজ আর দোয়ানিতে চলছে না, জোড়া ফী লাগবে, আমার আর হৈমীর। এমন সময়ে সুধা দোতলা হইতে নামিয়া আসিল। তাহাকে দেখিয়া হৈমবতী রান্নাঘরের দিকে প্রস্থান করিল। বিশুও হঠাৎ রুটির থালার প্রতি দৃষ্টিসংযোগ করিল। সুধা তাহার দিকে না তাকাইয়া মনোজকে কহিল, বাবা আপনাকে ডাকছেন, আসুন।—বলিয়া পিছন ফিরিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। মনোজ তাহার অনুসরণ করিবার উপক্রম করিতেই বিশু খপ করিয়া তাহার হাত ধরিয়া চাপা স্বরে কহিল, আমাদের ফীটা? মনোজ সিকিটি বাহির করিয়া তাহার হাতে দিতেই সুধা পিছন ফিরিয়া তাকাইয়া কহিল, ও কি হচ্ছে? বিশু যেন তাহার কথা শুনিতে পায় নাই, এমনই ভাবে আবার রুটি খাইতে শুরু করিল। মনোজ একটু হাসিয়া সুধার দিকে অগ্রসর হইল।

দোতলায় একটি সরু বারান্দার সামনে পাশাপাশি দুইটি ঘর। একটি অপেক্ষাকৃত বড়, আর একটি নেহাত ছোট। বড়টি রাঘববাবুর শয়নকক্ষ, ছোটটি সুধার শয়ন ও পাঠ কক্ষ দুইই। দুইটি ঘরের মধ্যে একটি সংযোগ-দ্বার আছে।

সুধা মনোজকে রাঘববাবুর শয়নকক্ষে আনিল। রাঘববাবু শুইয়া ছিলেন। উঠিয়া বসিয়া কহিলেন, এস বাবা।

একটু দাঁড়ান।—বলিয়া সুধা পাশের ঘর হইতে একটা চেয়ার

আনিতেই মনোজ কহিল, আপনি আবার কষ্ট করতে গেলেন কেন? সুধা কহিল, কষ্ট না করলে আপনি বসবেন কোথায়? দাঁড়িয়ে থাকতেন নাকি?

মনোজ অপ্রতিভভাবে কহিল, না না, তা নয়, মানে—

সুধা কহিল, বসুন।

রাঘববাবু কহিলেন, ব'স বাবা, কেমন আছ?

ভাল আছি, কিন্তু আপনার কি হয়েছে?

আমার সেই বাতের বেদনা আবার বেড়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে এ রকম হয়।

ওষুধপত্তর খান না কেন?

কি ওষুধ খাব?

কেন, হোমিওপ্যাথি?

মুখ বিকৃত করিয়া রাঘববাবু কহিলেন, অনেক খেয়েছি বাবা। কিছু হয় না, ও সেক-মালিশ ছাড়া উপায় নেই। সুধার দিকে তাকাইয়া কহিলেন, মা! তুমি পড়গে; মনোজবাবু তো রয়েছেন, ওঁর সঙ্গে একটু গপ্পসপ্প করি। মনোজের উদ্দেশে কহিলেন, মাস দেড়েক পরেই পরীক্ষা, কালও পড়তে পারে নি, আজও সকালটা মাটি হ'ল। স্কুলে যেতেও পারলে না! তা ছাড়া আমি নিজেও একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দিই, তাও হ'ল না, অবিশ্যি আমি আর কতটুকু পারি!

মনোজ এই সুযোগে ঝট করিয়া বলিয়া ফেলিল, কি বিষয়ে সাহায্য দরকার হয়?—বলিয়া সুধার দিকে তাকাইল। সুধা বোধ করি তাহারই দিকে তাকাইয়া ছিল; চোখোচোখি হইতেই মুখ ফিরাইয়া লইল, কিন্তু জবাব দিল না। জবাব দিলেন রাঘববাবু, ইংরেজীতে—

মনোজ কহিল, বলেন তো, আমি একটু আধটু সাহায্য করতে পারি।

আমার তো এম. এ.তে ওইই সাব্‌জেক্ট, বি. এ.তেও মন্দ ফল করি নি, ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিলাম।

রাঘববাবু বিস্ময় ও পুলক সহকারে কহিলেন, তাই নাকি! তা হ'লে তো খুব ভাল হয়, কিন্তু আপনার—মানে, তোমার নিজের কোন ক্ষতি হবে না তো? মনোজ পুনরায় সুধার পানে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল, এবারেও দৃষ্টি-বিনিময় ঘটিল। তারপর মনোজ কহিল, ক্ষতি! ক্ষতি কিসের? আমার পরীক্ষার এখনও অনেক দেরি। তা ছাড়া সন্ধ্যের সময় তো পড়ি না। তখন এসে একটু—। ঘাড় নাড়িয়া কহিল, কিছু ক্ষতি হবে না. বরং—। বলিতে ইচ্ছা হইল, প্রচুর লাভ হইবে, কিন্তু চাপিয়া গেল।

রাঘববাবু সুধার উদ্দেশে কহিলেন, তোমার শাপে বর হয়ে গেল মা। বি. এ.তে ইংরেজীতে ফার্স্ট ক্লাস, দুদিন পরেই এম. এ. হবেন, ওঁর কাছে প'ড়ে পরীক্ষায় ভাল ফল করতে না পারলে আর কাউকে দোষ দেওয়া চলবে না।—বলিয়া ঘাড়টি নাড়িতে লাগিলেন।

সুধা ধীর পদবিক্ষেপে নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

বেতনভোগী মাস্টার অপেক্ষাও মনোজ নিয়মিত হাজিরা দিতে লাগিল। ইংরেজী ভাষায় সুধার ব্যুৎপত্তি কিরূপ বাড়িতে লাগিল জানি না, কিন্তু তাহার হৃদয়ের মধ্যে একটি প্রেমের অঙ্কুর গজাইয়া উঠিয়া দিন দিন বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। কোন দিন মনোজের আসিতে একটু দেরি হইলে সুধা যেরূপ ছটফট করিত, কাজে অকাজে নীচের তলায় আনাগোনা করিত, তাহা যে নিছক পঠনপ্রিয়তার জন্য নহে, তাহা হৈমবতী পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিত। একদিন সন্ধ্যার পর নীচের তলায় আসিতেই হৈমী মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, মাস্টারবাবুর আসতে আজ ভারি দেরি হচ্ছে, না দিদিমণি? সুধা ধারালো গলায় জবাব দিল, তাতে

তোমার কি? তুমি নিজের কাজ করগে। হৈমী হাসি চাপিয়া কহিল, না, তাই বলছি।

আর মনোজের অবস্থা? লোকে যেমন শখ করিয়া আফিম খাইতে শেখে, মনোজ তেমনই শখ করিয়া প্রেম করিতে গিয়াছিল। ভাবিয়াছিল, যখন ইচ্ছা এ নেশা ছাড়িয়া দিবে। কিন্তু যত দিন যাইতে লাগিল, ততই নেশা জমিয়া উঠিতে লাগিল। আফিমখোরের আফিমের গুলি যেমন দিন দিন গোলার আকার ধারণ করিতে থাকে, মনোজের অধ্যাপনার সময়ও তেমনই দিন দিন বাড়িতে লাগিল। অহিফেনসেবীর মন যেমন সারাদিন সমস্ত কাজকর্ম্মের মধ্যে অহিফেন-সেবনের ক্ষণটির দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাইয়া থাকে, মনোজের মনও তেমনই ভাবে বাড়িতে পড়াশুনা ও কলেজে অধ্যাপকদের বক্তৃতা শ্রবণের মধ্যে অধ্যাপনার সময়টির দিকে তাকাইয়া থাকিত এবং যতক্ষণ অধ্যাপনা চলিত, ততক্ষণ তাহার সমস্ত অন্তর মাটির পৃথিবী ছাড়িয়া এক অমৃতলোকে উত্তীর্ণ হইত। সময়-স্রোত ও রক্তস্রোত দুইই বেগে প্রবাহিত হইত; হাতে হাতে ছোঁওয়া লাগিয়া সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎপ্রবাহ বহিত; চোখে চোখে চাহনি মিলিয়া মাথার স্নায়ুগুলা সেতারের তারের মত ঝনঝন করিয়া উঠিত, এবং যখন অধ্যাপনা শেষ হইত, তখন মিষ্টান্নলোভী মক্ষিকার মত মন কিছুতেই নড়িতে চাহিত না। তারপর মেসে ফিরিয়া যাহা হউক কিছু মুখে দিয়া, বন্ধুদের এড়াইয়া বিছানায় আসিয়া চিত হইয়া শুইয়া পড়িত বটে, কিন্তু সুধার সঙ্গস্মৃতির টুকরাগুলি বায়োস্কোপের ছবির মত তাহার মানসচক্ষের সামনে ক্রমাগত পারাপার করিয়া তাহার চোখের ঘুমকে দেশছাড়া করিত। কিছুদিন পরে এমন হইল যে, শুধু কিছুক্ষণের জন্য সুধার সঙ্গ পাইয়া মন তৃপ্ত হইতে চাহিল না, তাহাকে চিরদিনের জন্য একান্তভাবে পাইবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিল।

প্রায় মাস খানেক পরে একদিন পড়াইতে গিয়া মনোজ দেখিল, সুধা পড়িবার ঘরে অনুপস্থিত। টেবিলের উপরে একটি কাগজে লেখা, মাথা ধরেছে, আজ আর পড়ব না, ছাদে যাচ্ছি।

মনোজ কিংকর্ত্তব্য চিন্তা করিতে লাগিল। রাঘববাবুর বাতের বেদনা কয়েক দিন আবার বাড়িয়াছে। দরজার কাছে কান পাতিয়া তাঁহার শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়মিত মাত্রা শুনিয়া বুঝিল, তিনি ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। বিশুও এতক্ষণ নিশ্চয়ই রান্নাঘরে হৈমবতীর হৃদয়রাজ্যে হানা দিবার চেষ্টা করিতেছে। অতএব, মনোজ পা টিপিয়া টিপিয়া সরু সিঁড়ি দিয়া হাতড়াইতে হাতড়াইতে ছাদে উঠিল। নেহাত এক টুকরা ছাদ। এক দিকে একটা জলের ট্যাঙ্ক, তাহারই পাশে দাঁড়াইয়া সুধা পাশের বাড়ির দিকে তাকাইয়া ছিল। মনোজ একটু পায়ের শব্দ করিতেই সুধা একবার মুখ ফিরাইয়া তাকাইয়া আবার দেখিতে লাগিল। মনোজ আসিয়া কহিল, মাথা ধরেছে? সুধা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, ধরিয়াছে।

দুদিন পরেই পরীক্ষা, একটু পড়লে হ'ত না?

সুধা কহিল, না।

তা হ'লে আজ যাই, কি বল?

সুধা আবার ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না।

তবে কি করব?

যা ইচ্ছে।

মনোজ হাসিয়া কহিল, যা ইচ্ছে তা করলে তোমার কি ভাল লাগবে সুধা?

সুধা বিদ্যুৎ-গতিতে মুখামুখি হইয়া দুই ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, মানে?

মনোজ ঘাবড়াইয়া গিয়া কহিল, মানে, আমার ছাদ থেকে ঝাঁপ দিতে ইচ্ছে করছে।

সুধা বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, সে কি!

মনোজ বক্তৃতার স্বরে বলিতে লাগিল, হ্যাঁ সুধা, আমার ইচ্ছে হচ্ছে, ছাদ থেকে নীচে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি, হাত পা মাথা ভেঙে একেবারে চেপ্টে যাই। জীবন আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে সুধা।

সুধা প্রশ্ন করিল, আপনার মাথার যন্ত্রণা আবার বেড়েছে বুঝি?

মনোজ মাথা নাড়িয়া কহিল, না না, মাথার যন্ত্রণা নয়, বুকের। বুকে হাত দিয়া কহিল, ঠিক বুকের মাঝখানে।

তা হ'লে ঝাঁপ-টাপ না দিয়ে বাবার কাছে যান।

তোমার বাবার চিকিৎসায় সারবে না সুধা। এ শুধু সারাতে পারে একজন—

সুধা ক্ষুণ্ণ স্বরে কহিল, সে আবার কি? খুব বড় ডাক্তার বুঝি?

সুধার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া মনোজ কহিল, হ্যাঁ।

সুধা মুখ ফিরাইয়া লইয়া কহিল, বেশ। তার কাছেই যান তা হ'লে।

মনোজের ইচ্ছা হইল বলে, তার কাছেই তো এসেছি সুধা। কিন্তু বলিতে সাহস করিল না।

সুধা চুপ করিয়া সম্মুখের অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে কহিল, বেচারী!

মনোজ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, কে সুধা?

ওই মেয়েটি।—বলিয়া সুধা মস্তকের ইঙ্গিতে পাশের বাড়ির একটি আলোকোজ্জ্বল কক্ষকে নির্দ্দেশ করিল। মনোজ সেই দিকে তাকাইয়া দেখিল, একটি পালঙ্কে একজন রুগ্না স্ত্রীলোক শুইয়া আছে, তাহারই পাশে বসিয়া একজন মধ্যবয়সী মোটাসোটা লোক মেয়েটির বুকে মালিশ

করিতেছে। সুধা কহিল, কতদিন থেকে ভুগছে! কেমন সুন্দর চেহারা কেমন হয়ে গেছে! আমার সঙ্গে খুব ভাব ছিল। রোজ ছাদে এসে কত গল্প করত! আজকাল আর উঠতে পর্য্যন্ত পারে না। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, ডাক্তার বুঝি জবাব দিয়ে গেছে।

মনোজ চুপ করিয়া রহিল। সুধা কহিল, স্বামীটি ভারি ভাল; দিনরাত ওর সেবা করে। আবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আমি যদি ম'রে যেতাম!

মনোজ কহিল, ছিঃ সুধা, বলতে নেই।

সুধা বিষণ্ণ কণ্ঠে কহিতে লাগিল, সত্যি বলছি, আমার ভারি ইচ্ছে করে মরতে। বাবার শরীরের অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছে, বোধ হয় বেশি দিন আর বাঁচবেন না। তারপর আমার কি হবে বলতে পারেন? বিশুদা তো ওই মানুষ!

কেন সুধা, তোমার বিয়ে হবে, বর হবে—

সুধা ফিক করিয়া হাসিয়া কহিল, বরটি বুঝি আকাশ থেকে টুপ ক'রে পড়বে, না মনোজবাবু?

মনোজ কহিল, তা হয়তো পড়তে পারে, বলা তো যায় না! মানে, হয়তো একদিন হাতের কাছেই হাজির হয়ে যাবে।

সুধা নীরস কণ্ঠে কহিল, বাংলা দেশে বর পাওয়া অত সহজ নয় মনোজবাবু।

পাশের বাড়িতে স্বামীটি মালিশ শেষ করিয়া পত্নীকে উঠাইয়া বসাইল। তারপর একটি পেয়ালা করিয়া জল অথবা দুধ খাওয়াইতে লাগিল।

সুধা কহিল, আমার ভারী ইচ্ছে হয়, অমনই ক'রে কারও সেবা পেতে। যন্ত্রণাসূচক স্বরে কহিল, এই যে এত মাথার যন্ত্রণা, এমন কেউ

নেই যে, একটু টিপে দেয়।—বলিয়া আলিসার উপর দুই হাত রাখিয়া তাহার মধ্যে মাথাটি গুঁজিল।

মনোজ একেবারে কাছে আসিয়া কহিল, একটু টিপে দোব সুধা?

সুধা মাথা না তুলিয়া কহিল, দিন, কিন্তু আপনার আবার বুকের বেদনা—

তা হোক সুধা, সে সেরে যাবে এখন।—বলিয়া দুই হাত দিয়া কপালটি আস্তে আস্তে টিপিয়া দিতে লাগিল, ভ্রূর মাঝখানের ঠিক উপর হইতে কানের গোড়া পর্য্যন্ত। সুধার চুল হইতে একটি মিষ্ট গন্ধ আসিয়া নাসারন্ধ্রকে আপ্যায়িত করিতে লাগিল; হাতে লাগিতে লাগিল চুলের কোমল স্পর্শ। দুই-একগাছি চুল আঙুলে লাগিয়া একটু টান পড়িতেই সুধা কহিল, চুল টানছেন কেন? আলগা হয়ে যাবে যে।

মনোজ কহিল, না, টানি নি তো।

আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল, ঝিরঝির করিয়া বাতাস বহিতেছিল, কাঁছেপিঠে গাছ থাকিলে কোকিল বা পাপিয়ার ডাকও হয়তো শোনা যাইত। ঠিক এই অবস্থায় একজন তরুণীর মাথা টিপিবার সৌভাগ্য কোন দিন হইবে—মনোজ কি কখনও কল্পনা করিয়াছিল? যে স্পর্শ-সুখ মনে মনে কল্পনা করিয়া মনোজ কত দিন মাঝরাত্রিতে উত্তেজনায় বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া সারা বারান্দা, উপর নীচ ঘোড়দৌড় করিয়াছে, কলতলায় বালতি বালতি জল মাথায় ঢালিয়াছে, তাহাই এত সহজে হাতের মুঠার মধ্যে ধরা দিল, ইহা যেন তাহার বিশ্বাস হইতেছিল না। মনে হইল, স্বপ্ন দেখিতেছে নাকি? সামনে চাহিয়া দেখিল, পাশের বাড়ির পত্নী-অনুরক্ত স্বামীটি স্ত্রীকে শোয়াইয়া পাখা করিয়া মশা তাড়াইতে তাড়াইতে মশারি ফেলিতেছে। না না, স্বপ্ন নয়।

মনোজ ধীরে ধীরে মুখটি নামাইয়া সুধার মাথার কাছে লইয়া আসিয়া

চুলের গন্ধ শুঁকিতে লাগিল। একবার ইচ্ছা হইল, গালটি ওই নরম ভেল্‌ভেটের মত চুলের উপর রাখে, কিন্তু ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার পূর্ব্বেই সুধা হঠাৎ মাথা তুলিতেই মনোজের নাকে ঠোকা লাগিল। মনোজ 'উঃ' করিয়া উঠিল।

সুধা বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, কি হ'ল?

কিছু না।—বলিয়া মনোজ নাকে হাত বুলাইতে লাগিল।

সুধা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, করছিলেন কি?

মনোজ অপ্রতিভভাবে কহিল, কিছু না, মানে—দেখছিলাম।

সুধা প্রশ্ন করিল, কি দেখছিলেন?

তোমার চুল। ওঃ, তোমার কত চুল সুধা!

সুধা সন্দিগ্ধ স্বরে কহিল, আপনি বুঝি ভাবছেন, এ নকল চুল, না? আপনি তো ভারি সাংঘাতিক লোক দেখছি!

মনোজ প্রতিবাদ করিয়া কহিল, তা নয়, আমার দেখতে ভাল লাগছিল, মানে—

বাধা দিয়া সুধা কহিল, ভাল লাগছিল, না আর কিছু পরীক্ষা ক'রে দেখছিলেন? কিন্তু সত্যি বলছি, এ আমার আসল চুল। এক এক গাছি করিয়া চুল টানিয়া টানিয়া কহিল, এই দেখুন, ছিঁড়ছে না, এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না?

মনোজ কহিল, আমায় বিশ্বাস কর সুধা, আমি পরীক্ষা করি নি, তোমার চুলের গন্ধ শুঁকছিলাম। ভারি মিষ্টি গন্ধ! কিন্তু এমনই ঠুকে দিলে, নাকটা ঝনঝন করছে!

সুধা মৃদু হাসিয়া কহিল, বেশ হয়েছে। কেন আমার চুলের গন্ধ চুরি করছিলেন? খুব লেগেছে? দোব হাত বুলিয়ে?

মনোজ নাক বাড়াইয়া দিয়া কহিল, দাও।

সুধা নাকে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। মনোজ কিছুক্ষণ আরামে চোখ মুদিয়া থাকিয়া কহিল, কিন্তু আমার বুকের বেদনাটা কি হবে সুধা?

সুধা কহিল, ওর আর আমি কি করব? কে যে বড় ডাক্তার আছে, তার কাছে যাবেন। বলেন তো কিছুক্ষণ হাত বুলিয়ে দিতে পারি।

কিন্তু সে বড় ডাক্তার তো তুমিই সুধা। তোমার ওষুধেই আমার বেদনা সারবে।

মনোজের বক্তব্য বুঝিতে পারিয়া সলজ্জ হাস্যে সুধার মুখ ঝলমল করিয়া উঠিল। কিন্তু না বুঝিবার ভান করিয়া কহিল, বারে! আমি কিসের ডাক্তার! কোথায় পাব আমি ওষুধ?

মনোজ গাঢ় স্বরে কহিল, সুধা, তুমি যদি অনুমতি দাও তো, আমার নিজের ওষুধ আমি নিজেই ঠিক ক'রে নিতে পারি।—বলিয়া একদৃষ্টে সুধার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

সুধাও মনোজের মুখের পানে তাকাইল। দুইটি দৃষ্টি যেন পরস্পরকে আলিঙ্গন করিল। সুধা রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, তাই নাও।

মনোজ দুই হাতে সুধাকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়া তাহার মাথাটি নিজের বুকে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, এই আমার অমোঘ ঔষধ—বক্ষ-বেদনা-নিবারণী বটিকা। এক মিনিটে বেদনা আমার ভাল হয়ে গেল সুধা।

সুধা চাপা স্বরে কহিল, ছাড় না, দম বন্ধ হয়ে আসছে যে!

মনোজ সুধাকে ছাড়িয়া দিতেই, সুধা এক অদ্ভুত ধরনের হাসি হাসিয়া কহিল, ভারি দুষ্টু তুমি।

মনোজও হাসিয়া কহিল, দুষ্টুমি না করলে উপায় কি সুধা? তোমরা যে ভালমানষির মূল্য দাও না। কিন্তু আমার কথা ফলল তো?

সুধা বিস্মিত স্বরে প্রশ্ন করিল, কি কথা?

সেই যে বলছিলাম, তোমার বরকে তোমার হাতের কাছে পাবে, পেলে তো ?

সেই দিন বাড়ি ফিরিবার সময়ে মনোজের দেহ পাঁচ মাইল বেগে চলিলেও মন পাঁচ শত মাইল বেগে ছুটিতেছিল, কত নূতন, কত আজব কল্পনা-রাজ্যের ভিতর দিয়া। হঠাৎ পিছন হইতে ডাক পড়িল, এই দোয়ানিবাবু! শুনুন। যেন পাহারাওয়ালা ডাক দিল, অ্যাই রোকো। মনোজকে মনের ব্রেক কষিতে হইল। পিছন ফিরিয়া তাকাইয়া দেখিল, লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া বিশু আসিতেছে। নাগাল ধরিয়া বিশু কহিল, চলুন, রাস্তায় যেতে যেতে বলছি। মনোজের দেহের গতি আবার শুরু হইল, কিন্তু মন ঠায় দাঁড়াইয়া রহিল।

বিশু কহিল, মামাকে আর সুধাকে তো খুব হাত করেছেন। একটা কাজ ক'রে দিতে পারেন ?

পৃথিবীতে এমন কি কাজ আছে, যাহা বিশ্বম্ভর একা করিতে পারে না, মনোজের মত লোকের উপর নির্ভর করিতে হয় ? মনোজ কহিল, কি ?

বিশু জবাব দিল, হৈমীকে ভালবাসি।

মনোজ ইহা অনেক দিন আগেই সন্দেহ করিয়াছিল, কাজেই স্বাভাবিক কণ্ঠে কহিল, বেশ তো।

ওকে বিয়ে করব।

করুনগে।

বিশু দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া কহিল, করুনগে! বলবার ভাবনা কি ? মামার মত নিতে হবে না ? বিধবা যে!

যেন মাতুলদের মত হইয়া গেলেই বিধবাবিবাহ হিন্দু-সমাজে চালু হইয়া যাইবে।

মনোজ কহিল, তা আমাকে কি করতে হবে ?

মামার মত করিয়ে দিতে হবে।

আমি বললেই আপনার মামা মত দেবেন, আপনার এ বিশ্বাস হ'ল কি ক'রে?

ভুরু নাচাইয়া, চক্ষু চড়াইয়া, মাথা উঁচাইয়া বিশু কহিল, বিশ্বাস হবে না কেন? এত বড় ধাড়ী মেয়েকে আপনার কাছে বেওজোর ছেড়ে দিতে পারেন, আর আপনার কথা শুনবেন না? খুব শুনবেন। আপনি ব'লেই দেখুন না।

মনোজ ঢোঁক গিলিয়া কহিল, রাঘববাবুর বাতের বাড়াবাড়িটা একটু কেটে গেলে হয় না?

বিশু প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, না না, মামার বাতের বাড়াবাড়ি না মরলে সারবে না। ততদিন বিয়ের জন্যে ব'সে থাকতে হবে নাকি? তা ছাড়া শিগগির বিয়ে না হ'লে হৈমী দেশান্তরী হবে বলছে।

মনোজ বিশুর মুখের দিকে তাকাইল। গ্যাসের আলো লাগিয়া ব্রণবহুল তৈলাক্ত মুখ চকচক করিতেছে, কোটরগত চোখ দুইটা জ্বলজ্বল করিতেছে, মোটা মোটা ঠোঁট দুইটা কাঁপিতেছে। বিশু ভালবাসিয়াছে হৈমীকে; হৈমী বিধবা, যৌবনে তাহার ভাটা আসিয়াছে, ভালবাসায় গাঁজ ধরিয়াছে। মনোজও তো ভালবাসিয়াছে সুধাকে; সুধা তরুণী কুমারী, জীবনবৃন্তে এই তাহার প্রথম মুকুল দেখা দিয়াছে। তাহা হউক, ভালবাসার কি জাতিভেদ, শ্রেণীভেদ আছে? সে ও বিশু দুইজনেই নিখিল-পৃথ্বী-প্রেমিকসঙ্ঘের চারি আনার সভ্য।

রাঘববাবুকে বলি বলি করিয়াও মনোজ বলিতে পারিল না। কিন্তু বলার দরকারও হইল না। একদিন রাত্রে বিশুকে লইয়া হৈমী উধাও হইয়া গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে উধাও হইল রান্নাঘরের হাঁড়ি, কড়াই, থালা, বাটি, গ্লাস, দুইটি ট্রাঙ্ক—একটি রাঘববাবুর আর একটি সুধার,

সুধার এক জোড়া দুল, এক কৌটা পাউডার, এক শিশি স্নো, এক শিশি এসেন্স ইত্যাদি।

পাশের বাড়ির চাকরের মারফত খবর পাইয়া মনোজ আসিয়া হাজির হইল। রাঘববাবু কাতরাইতে কাতরাইতে যাহা জ্ঞাপন করিলেন, তাহার সার মর্ম্ম এই—তাহার খাইয়া বড় হইয়া যে নেমকহারাম তাঁহার মুখের দিকে তাকাইল না, একটা বিধবার মোহে তাঁহাকে এই অবস্থায় ফেলিয়া চলিয়া গেল, ভগবান তাঁহার মঙ্গল করিবেন না। পৃথিবীতে কাহারও উপকার করিতে নাই।

সুধা কহিল, কি করা যায় বল দেখি? বাবার ওই রকম শরীর, ওঁকে নিয়ে আমি একা একা এই বাড়িতে থাকব কি ক'রে?

মনোজ সাহস দিয়া কহিল, ভয় কি? সব ব্যবস্থা করছি আমি।

সুধা শোকার্ত্ত কণ্ঠে কহিল, ভাল ভাল শাড়িগুলো নিয়ে পালাল পোড়ামুখী! নতুন কিনেছিলাম, একবার পরি নি পর্য্যন্ত। তা ছাড়া দুল জোড়াটা—। সুধার চোখে জল আসিল। তাহার বড় সাধের দুল দুইটি দগ্ধবদনীর কুলার মত কান হইতে দুলিতে থাকিবে, তাহা মনে করিয়া তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

মনোজ দুঃখ প্রকাশ করিল বটে, কিন্তু সত্য বলিতে কি, তাহার মনে দুঃখ না হইয়া বরং আনন্দই হইতেছিল; এবং সুধা ও তাহার রুগ্ন পিতাকে কেবলমাত্র তাহারই স্কন্ধে সঁপিয়া দিয়া যাওয়ার জন্য বিশু ও হৈমীকে মনোজ মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিতেছিল।

মনোজকেই সুধাদের সংসারের হাল ধরিতে হইল। জিনিসপত্র দেখিয়া শুনিয়া কিনিয়া আনিল। দিনরাত থাকিবার জন্য একজন বুড়ী ঝি ও রান্না করিবার জন্য একজন ঠাকুর সংগ্রহ করিল এবং নিজে সকালে ও সন্ধ্যায় আসিয়া তদারক করিতে লাগিল।

ভালই হইল। কারণ সুধার পরীক্ষা হইয়া গেলেও মনোজের আনাগোনা করার অছিলার অভাব রহিল না।

সুধার কড়া তাগিদও ছিল। একদিন না গেলে সুধা রাগ করিত, অভিমান করিত ; একদিন ধমক দিয়াছিল।

মেয়েদের ধরনই এই। দেওয়া-নেওয়া ব্যাপারে তাহারা মধ্যপন্থা ভালবাসে না। হয় কিছুই দেয় না, দেওয়ার ভান করে মাত্র ; কিন্তু যখন দেয়, পাত্র উজাড় করিয়া দেয়। অথচ পাওনাটা পুরাপুরি হইল কি না, বুঝিতে পারে না। তাই অনুক্ষণ মনে সন্দেহ জাগে, ভয় হয় ; মান ও অভিমানের অস্ত্র হানিয়া বাকি বকেয়া উসুল করিবার চেষ্টা করে। সুধা মনোজের কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। তাই মনোজকে একান্তভাবে পাইবার জন্য তাহার মন সর্ব্বক্ষণ ব্যাকুল হইয়া থাকিত। একদিন বলিল, সেই সকালবেলায় একটিবার, সন্ধ্যেবেলায় একটিবার দেখা! সারাদিন আমার কি ক'রে কাটে বল দেখি? তুমি মেস্ ছেড়ে এখানে চ'লে এস।

মনোজ কহিল, তা কি হয়? তোমার বাবা কি বলবেন?

বাবা কিছু বলবেন না, বরং সুখী হবেন। উনি কি কিছু বুঝতে পারেন নি ভেবেছ?

মনোজ চুপ করিয়া রহিল।

সুধা একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া, মুখ ফিরাইয়া নীরস কণ্ঠে কহিল, ও, এখানে তোমার কষ্ট হবে বুঝি?

মনোজ কাছে ঘেঁষিয়া কহিল, কষ্ট! না সুধা, এখানে এলে আমার স্বর্গলাভ হবে। কিন্তু বাবা হয়তো কোন্ দিন এসে পড়তে পারেন।

সুধা কহিল, এলেই বা! তিনি সব জানতে পারবেন। তাঁর কাছে আর তো কিছু গোপন করা উচিত নয়।

সুধার প্রেম

না সুধা, পরীক্ষার পর গিয়ে তাঁদের সব কথা বলব। তারপর তাঁদের মত নিয়ে—। মনোজ বাক্যের পরিবর্ত্তে কার্য্যের দ্বারা বক্তব্য বিষয় সুস্পষ্ট করিবার জন্য সুধাকে কাছে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিতেই, সুধা নিজেকে ছাড়াইয়া লইয়া কহিল, যদি তাঁদের মত না হয়?

মনোজ দৃঢ় কণ্ঠে কহিল, তাঁদের মত না হ'লেও আমার মতি স্থির থাকবে। সুধা ছাড়া আমি বাঁচব না, সুধা।

সুধা কাছে সরিয়া আসিয়া মনোজের মুখের দিকে তাকাইয়া কহিল, সত্যি বলছ? সুধাতে তোমার কোন দিন অরুচি হবে না?

না সুধা, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর।

মনোজের বুকে মাথা রাখিয়া সুধা কহিল, আমার বড় ভয় হয়।

দুপুরবেলায় নিজের ছোট ঘরটির জানালার ধারে দাঁড়াইয়া সুধা আজকাল স্বপ্ন দেখে, একটি সুন্দর ছোট বাড়ি, তাহার নিজের হাতে মনের মত করিয়া সাজানো; ছোট্ট সংসার, সে আর মনোজ, আর হয়তো বাবা, আর—আর, একটি পদ্মকলির মত ছোট্ট খোকা, ধবধবে রঙ, মুখ-চোখ ঠিক মনোজের মত।

একদিন দুপুরবেলায় পাশের বাড়ির মেয়েটি মারা গেল। স্বামী বেচারীর কি কান্না! গড়াগড়ি দিয়া সারা মেঝেটার ধূলা গায়ে মাখিল, চোখের জলে মোটা গোঁফজোড়া ভিজিয়া ন্যাতা হইয়া গেল।

সন্ধ্যার পর সুধা ছাদে দাঁড়াইয়া মেয়েটির ঘরের দিকে তাকাইয়া ছিল। ঘরে আজ আর আলো জ্বালা হয় নাই। স্বামী বেচারা একটি চাদর গায়ে দিয়া মাতৃহীন শিশুটিকে কোলে লইয়া দোতলার বারান্দায় পায়চারি করিতেছিল।

মেয়েটিকে সুধার মনে পড়িল। পাতলা ছিপছিপে গঠন, ফরসা রঙ, কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, ডাগর চোখ। মুখের হাসিটি চমৎকার, একটুতে

খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিত। কেমন এক রকম আবদারী ধরনে কথা বলিত। আবদার হইবে না কেন? স্বামীর কত আদর! দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী যে! একদিন বলিয়াছিল, দ্বিতীয় পক্ষ দেখে বিয়ে করবি, কত আদর দেখবি, চোখের আড় করতে চাইবে না, হেঁটে গেলে বুক পেতে দেবে। ছোকরা স্বামীগুলোর ভারি অহঙ্কার, চোখ পেতে চেয়েও দেখতে চায় না।

সুধার গা-ছমছম করিতে লাগিল। এত সুখ, এত আদর মেয়েটি কি ভুলিতে পারিয়াছে! হয়তো এখনও ওখানে ঘুরঘুর করিতেছে, ও ঘরটিতে আজ আলো জ্বালা উচিত ছিল—। হঠাৎ কাহার স্পর্শে 'মা গো' বলিয়া চমকিয়া উঠিয়া সুধা পিছন ফিরিয়া তাকাইয়া দেখিল, মনোজ। কহিল, তুমি! এমন ভয় পেয়েছিলাম! আজ এত দেরি হ'ল?

মনোজ কহিল, পড়ছিলাম, পরীক্ষার তো আর দেরি নেই। সুধা অভিমানের সহিত কহিল, পরীক্ষা! ও, মনে ছিল না। মনোজ সুধাকে কাছে টানিয়া কহিল, রাগ ক'রো না সুধা। সুধা শুষ্ক স্বরে কহিল, না, রাগ কিসের! মনটা আমার ভাল নেই। ও বাড়ির বউটি আজ মারা গেছে।

মনোজ কহিল, তাই নাকি? তা হ'লে তো ভদ্রলোকের ভারি মুশকিল হ'ল দেখছি!

সুধা কহিল, সত্যি। দু-তিনটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে।

মনোজ কহিল, তা হোক, মুশকিল আসান হতেও দেরি হবে না।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সুধা প্রশ্ন করিল, কেন?

তৃতীয় পক্ষ তাড়াতাড়ি এসে পড়বেন।

সুধা কহিল, পাগল নাকি! কখনও আর বিয়ে করবে না। ভারি ভালবাসত বউকে, আমার নিজের চোখে দেখা।

মনোজ জবাব দিল না।

সুধা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, আজ ভাবছিলাম—। বলিয়া থামিয়া গিয়া লজ্জিত মুখে মৃদু হাসিল। মনোজ কহিল, কি? সুধা ইতস্তত করিয়া কহিল, ভাবছিলুম, যদি শিগগির ম'রে যাই, তা হ'লে আর তোমাকে আমার পাওয়া হবে না, ভূত হয়ে চিরদিন হা-হা ক'রে বেড়াব।

মনোজ কহিল, তুমি তো আমাকে পেয়েছ সুধা। আমাদের সত্যিকার বিয়ে হয়ে গেছে, শুধু গোটা কয়েক মন্ত্র পড়া বাকি, তারও আর বেশি দেরি নেই। পরীক্ষাটা হয়ে গেলে আসছে অঘ্রাণেই বিয়ে হবে। তারপর জিনে জোঁকের মত এমনই কামড়ে প'ড়ে থাকব যে, টেনেও ছাড়াতে পারবে না।

সুধা সেই অন্ধকার ঘরটির দিকে তাকাইয়া কহিল, কে জানে, কপালে কি আছে, ভারি জানতে ইচ্ছে করে।

সুধার পরীক্ষার খবর বাহির হইল। প্রথম বিভাগে পাস করিয়াছে। রাঘববাবু খবর শুনিয়া খুব আনন্দিত হইলেন। কহিলেন, মনোজকে রাত্রে নেমন্তন্ন কর, ওর চেষ্টাতেই তো হ'ল।

রাত্রিতে গিয়া মনোজ দেখিল, শুধু সে-ই নিমন্ত্রিত নহে।—আর এক ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়াছে এবং তাহার আগেই আসিয়া আসর জমাইয়া বসিয়া আছে। খুব সম্ভব পাশের বাড়ির সদ্যবিপত্নীক ভদ্রলোক, পত্নী-বিসর্জ্জনের পর গোঁফজোড়াটিও বিসর্জ্জন দিয়াছে। গায়ে গলাবন্ধ কোট, মাথায় কাঁচা-পাকা চুলে টেড়ি, পায়ে সদ্য-ক্রীত অ্যাল্‌বার্ট জুতা। একটা চেয়ারে বসিয়া দরজার দিকে সতর্ক দৃষ্টি পাতিয়া রাখিয়াছে।

মনোজকে দেখিয়া ভদ্রলোক উঠিয়া দাঁড়াইয়া বোকার মত হাসিতে

লাগিল। রাঘববাবু মনোজের পরিচয় দিয়া, তাহাকে নিজের বিছানায় বসিতে বলিলেন। মনোজ বসিলে ভদ্রলোকও বসিল, কিন্তু তাহার চোখ দুইটা ঘন ঘন দরজার দিকে ফিরিতে লাগিল।

সুধা বোধ করি নিজে রাঁধিতেছিল। একবার রাঘববাবুকে কি জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আসিল। মনোজ লক্ষ্য করিল, আজ তাহার কেশে ও বেশে যেন একটু বিশেষ পারিপাট্য। যে দুল জোড়াটি মনোজ নিজে কিনিয়া দিয়াছে, সেইটি পরিয়াছে, পরনেও সেই শাড়িটি, যেটি মনোজ নিজে পছন্দ করিয়াছিল। সুধা ভদ্রলোককে দেখিয়া নমস্কার করিল এবং মনোজের দিকে একবার তাকাইয়াই মুখ ফিরাইয়া অন্য সকলের অলক্ষ্যে মুচকি হাসিল। মনোজ রাঘববাবুর সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে আড়চোখে চাহিয়া দেখিল, ভদ্রলোক সুধার দিকে প্যাটপ্যাট করিয়া তাকাইয়া আছে।

সুধা রাঘববাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, বাবা, তুমি কি ভাত খাবে, না খান কয়েক লুচি ভেজে দোব?

রাঘববাবু কহিলেন, থাক মা, আর লুচি ভেজে কাজ নেই; এঁদের সঙ্গে যা পারি দু মুঠো খাব।

সুধা চলিয়া গেল, ভদ্রলোকের দৃষ্টিও দরজা পর্য্যন্ত তাহাকে অনুসরণ করিল।

মনোজ ভাবিতে লাগিল, ভদ্রলোকের এত দৃষ্টি-দাক্ষিণ্য কেন? আর ইহাকে ডাকিয়া আনারই বা কি প্রয়োজন? রাঘববাবু কি সুধাকে তৃতীয়-পক্ষ-পদের জন্য উমেদার দাঁড় করাইতেছেন নাকি?

কাজের অছিলায় উঠিয়া গিয়া মনোজ সটান রান্নাঘরে আসিয়া হাজির হইল। সুধা রান্নাঘরের বারান্দায় একটা স্টোভের উপর তাওয়া চাপাইয়া মাংসের চপ ভাজিতেছিল, মনোজকে দেখিয়া মুচকি হাসিয়া কহিল,

এই গরমের মধ্যে আবার এলে কেন? চপ খাবে তো ওই প্লেটটা নিয়ে এস।

খাইতে খাইতে মনোজ কহিল, যা পারি খেয়ে নিই বাবা। যা ভস্মলোচনকে নেমন্তন্ন করেছ, কাউকে আজ আর কিছু পেতে হবে না, একাই সব সেঁটে দিয়ে যাবে, মায় তোমাকে পর্য্যন্ত।

সুধা বিস্মিত মুখে কহিল, ভস্মলোচন! পরক্ষণেই বুঝিতে পারিয়া কহিল, ও, ভূষণবাবু! ভারি ভালমানুষ, বাবার সঙ্গে আলাপ হয়েছে।

হঠাৎ আলাপ করবার উদ্দেশ্য? এতদিন তো করে নি!

একলা মন টিকছে না, তাই লোকের সঙ্গ খুঁজছেন।

মনোজ রাগত স্বরে কহিল, সঙ্গ খুঁজছেন! পাড়াতে আর সঙ্গ জুটল না বুঝি? তাই এই বাড়িতে জুটেছে! ও ঠিক তোমার ওপর তাক করেছে, আমি ব'লে দিচ্ছি, যা তোমার দিকে চাচ্ছিল, যেন গিলে খাবে।

মনোজের রাগ দেখিয়া সুধার হাসি পাইতেছিল। হাসি চাপিয়া কহিল, চাচ্ছিলেন বুঝি? বুঝতে পারি নি।

মনোজ তীক্ষ্ণ স্বরে কহিল, বুঝতে পার নি খুব ভাগ্যি, না হ'লে এতক্ষণ ওর পেটের মধ্যে গিয়ে হজম হয়ে যেতে।

সুধা কহিল, আর তোমার রাগ ক'রে কাজ নেই বাপু। ওঁর সামনে আর না গেলেই তো হ'ল!

মনোজ অপ্রতিভ হইয়া কহিল, না না, যাবে না কেন, নেমন্তন্ন করেছ যখন? তবে একটু সাবধানে থেকো, বেশি মাখামাখি ক'রো না।

সুধা এবার রাগ করিয়া কহিল, আমার কি মাখামাখি করবার লোক নেই নাকি? তোমার যেমন কথা!

বিশ্বম্ভর দিন কয়েক পরে ফিরিয়া আসিল। এক মুসলমান দর্জি বিশুর পাড়াতেই থাকিত। সেই নাকি চোরের উপর বাটপাড়ি করিয়াছে। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর একসঙ্গে শুইয়া ছিল, সকালে উঠিয়া দেখে, হৈমবতী পলাইয়াছে, ঘর একেবারে খালি। রাঘববাবু নাকি আসিবামাত্র দূর হইয়া যাইতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু বিশু তাহাতে কর্ণপাত করে নাই; যেন কিছুই হয় নাই, এমনই ভাব দেখাইয়া নিজের কাজে লাগিয়া গিয়াছে।

মনোজকে দেখিয়া বিশু ভ্রূ নাচাইয়া প্রশ্ন করিল, কেমন আছেন? চলছে কেমন? মনোজ কথার জবাব না দিয়া কহিল, ফিরে এলেন যে? বিশু কড়া চোখে চাহিয়া কহিল, ফিরে এলেন যে! বললুম তখন মামাকে ব'লে বিয়ে দিয়ে দিতে। বিয়ে হ'লে কি মাগী পালাতে পারত? ঘাড় ধ'রে টেনে নিয়ে আসতুম।—বলিয়া টানিয়া-আনা-সূচক হস্তভঙ্গী করিল। তারপর কিছুক্ষণ মাটির দিকে তাকাইয়া থাকিয়া প্রবল নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, মেয়েমানুষকে বিশ্বাস করবেন না, বুঝলেন, খবরদার বিশ্বাস করবেন না। মনোজ চুপ করিয়া রহিল। বিশু ধমকাইয়া কহিল, কথাটা ভাল লাগছে না বুঝি? নাসিকা উঁচাইয়া কহিল, ভাল লাগবে কেন? ভাল কথা কারও ভাল লাগে না আজকাল। দুটো পয়সা দিতে পারেন?

মনোজ কহিল, পয়সা কি করবেন?

বিশু দুই ভ্রূ কুঁচকাইয়া কহিল, দুটো পয়সার জন্যে কৈফিয়ৎ! মনোজ পয়সা দিতেই তাহা ট্যাঁকে গুঁজিয়া কহিল, গাঁজা কিনব, গাঁজা খেতে ধরেছি, নেশাতে বুঁদ হয়ে থাকি দিনরাত, না হ'লে যে হতভাগীকে ভুলতে পারি না।

মনোজের পরীক্ষা হইয়া গেল। বাড়ি যাইবার দিন সন্ধ্যায় সুধার সহিত দেখা করিতে গেল। সুধা তাহার ঘরে ছিল না। মনোজ ছাদে গিয়া দেখিল, সুধা মুখটি চুন করিয়া জলের ট্যাঙ্কটার পাশে বসিয়া আছে। মনোজকে দেখিয়া কহিল, এসেছ! এখানে এস, ব'স।—বলিয়া একটু সরিয়া বসিয়া পাশের জায়গাটি আঁচল দিয়া পরিষ্কার করিয়া দিল।

মনোজ কহিল, ও কি হচ্ছে! কাপড়টা ময়লা করছ কেন?

সুধা কহিল, তা হোক, ব'স। মনোজ বসিতেই সুধা তাহার একটি হাত নিজের কোলে তুলিয়া লইয়া শুষ্ক স্বরে কহিল, আজই যাবে?

মনোজ কহিল, হ্যাঁ।

কটায় ট্রেন?

রাত নটায়।

তা হ'লে তো এখনই চ'লে যেতে হবে। একটু আগে এলে না কেন? আমি কতক্ষণ থেকে পথ চেয়ে ব'সে আছি।—বলিতে বলিতে গলা ধরিয়া আসিল।

মনোজ সুধার মুখটি নিজের বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া কহিল, আরে! কাঁদছ নাকি? পাগল! একটা জিনিস কিনতে দেরি হয়ে গেল।

সুধা মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল, কি জিনিস?

মনোজ বেকার হাতটি দিয়া পকেট হইতে একটি ছোট রঙিন বাক্স বাহির করিয়া কহিল, কি বল দেখি?

সুধা নিজেকে ছাড়াইয়া লইয়া কহিল, বলছি, আগে দেখি।

মনোজ হাসিয়া কহিল, বারে! দেখে তো সবাই বলতে পারে, তুমি আন্দাজ কর তো দেখি।

খপ করিয়া মনোজের হাত হইতে বাক্সটি কাড়িয়া লইয়া খুলিতেই

সুধার মুখ আনন্দে জ্বলজ্বল করিয়া উঠিল। বাক্সটির মধ্যে কালো ভেল্‌ভেটের উপর একটি চমৎকার সোনার আংটি। সুধা কহিল, আমার জন্যে বুঝি ?

মনোজ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

সুধা গম্ভীর হইয়া কহিল, আমাকে পরিয়ে দাও।

রাঘববাবুকে প্রণাম করিয়া মনোজ বিদায় লইল। রাঘববাবু কহিলেন, বেশি দিন ভুলে থেকো না বাবা। তোমাকে একদিন না দেখলে মন কেমন করে।

যাইবার আগে সুধা কহিল, তোমার একটা প্রণাম পাওনা আছে।—বলিয়া মনোজকে প্রণাম করিয়া সুধা কহিল, আমাকে আশীর্ব্বাদ করলে না? মনোজ কহিল, করলাম বইকি।

সুধা প্রশ্ন করিল, কি আশীর্ব্বাদ করলে ?

মনোজ কহিল, করলাম, চমৎকার বর হোক, আমার চেয়ে সুন্দর।

সুধা অশ্রুম্লান চোখ দুইটি মনোজের দিকে স্থিরভাবে রাখিয়া কহিল, তাই করলে বুঝি ? তারপর মনোজের বুকে মাথা রাখিয়া কহিল, আরও সুন্দর আমি চাই না, আমার এই ভাল।

বাহিরের দরজা পর্য্যন্ত সঙ্গে আসিয়া সুধা অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে কহিল, বেশি দেরি করো না, যত শিগগির পার ফিরে এস, বুঝলে ?

মনোজ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, সে ফিরিবে।

৩

বেলা এগারোটার সময়ে মনোজ গন্তব্য স্টেশনে গাড়ি হইতে নামিল। স্টেশনটি ছোট, কিন্তু স্টেশনের মাস্টারটি বৃহৎ। একটা মোটা ও লম্বা

পাশ-বালিশের অধোদেশে এক জোড়া পা ও শীর্ষদেশে একটি তিন নম্বরের ফুটবল জুড়িয়া দিলে যেমনটি দেখিতে হয়, মাস্টার মহাশয়ের চেহারাটি অনেকটা সেই রকম। গায়ে কোম্পানির দেওয়া সাদা জিনের গলাবন্ধ কোট, তাহাতে কোম্পানির নাম-লেখা পিতলের বোতাম। পরিধানে ধুতি, কোঁচাটি দুই ভাঁজ হইয়া কোমরে গোঁজা। পায়ে চটি, মাথায় কালো টুপি, টুপির সামনে মাস্টার মহাশয়ের পদমর্য্যাদা পালিশ-করা পিতলের অক্ষরে লেখা রহিয়াছে। মাস্টার মহাশয় দরকারী কাগজপত্র লইয়া গার্ডের কামরার দিকে যতদূর সম্ভব দ্রুতবেগে ছুটিতেছিলেন, হঠাৎ মধ্যম শ্রেণীর কামরা হইতে মনোজকে নামিতে দেখিয়া এক গাল হাসিয়া কহিলেন, এসে গেছেন? দাঁড়ান, আসছি।—বলিয়া আবার ছুটিলেন। মনোজ দাঁড়াইয়া রহিল। গাড়ি চলিয়া গেল। স্টেশন-মাস্টার হেলিতে দুলিতে আসিয়া কহিলেন, আসুন। আপনি তো নতুন জমিদারবাবুদের বাড়িতে যাবেন?

মনোজ কহিল, হ্যাঁ।

আপিসে বসাইয়া স্টেশন-মাস্টার কহিলেন, ম্যানেজারবাবু কাল বিকেলে এসেছিলেন। সকালে কি কাজ আছে, নিজে আসতে পারবেন না। তবে সব ব্যবস্থা ক'রে গেছেন। গরুর গাড়ি প্রস্তুত, ইচ্ছে করলে তাতেও যেতে পারেন, না হ'লে হেঁটেও যেতে পারেন। এখান থেকে মাত্র তিন মাইল রাস্তা, রাস্তাও ভাল। ম্যানেজারবাবু বুঝি আপনার আত্মীয়?

মনোজ কহিল, হ্যাঁ, আমার নিজের মামা।

মাস্টার মহাশয় ঘাড় কাত করিয়া কহিলেন, নিজের মামা! তারপর ঘাড়টি আবার সোজা করিয়া বলিতে লাগিলেন, ম্যানেজারবাবু চমৎকার লোক। আমাদের সঙ্গে, বিশেষ ক'রে আমার সঙ্গে, খুব ভাব, পূজোর

সময় দু দিন যাত্রা হ'ল, দু দিনই আমাদের নেমন্তন্ন করলেন, ঠিক আসরের মাঝখানে বসিয়ে দিলেন, সবাই হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইল, ভাবলে, বুঝি জমিদারের নিজের লোক, এমন কি ভীম স্বয়ং এসে বিড়ি চেয়ে খেল মশায়! সত্যি, চমৎকার লোক, তা সিগারেট-টিগারেট খান নাকি?

মনোজ মৃদু হাসিয়া একটি সিগারেট প্যাকেট হইতে বাহির করিয়া দিল। মাস্টার সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে কহিল, ভাল লাগে খেতে, কিন্তু কিচ্ছু পাওয়া যায় না এখানে, অজ পাড়াগাঁ কিনা, বিড়িই খেতে হয়, তা ছাড়া দামও বেশি। এক টানে প্রায় অর্দ্ধেকটা শেষ করিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, ভয় নেই, ওখানে আজকাল পাওয়া যাচ্ছে, ম্যানেজারবাবু ব্যবস্থা করেছেন।

গরুর গাড়িতে বাক্স বিছানা চাপাইয়া দিয়া মনোজ তাহার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিয়া চলিল। গাড়োয়ান তাহাকে গাড়িতে চাপিবার জন্য বিস্তর অনুনয়-বিনয় করিয়াছিল, বলিয়াছিল, হাঁটিয়ে নিয়ে গেলে গোমস্তাবাবু আমাকে 'জান-বাছা' গাড়বেন হুজুর।

মনোজ তাহাকে 'কিছু ভয় নাই' বলিয়া বার বার অভয় দিবার পর সে গাড়ি জুতিয়াছিল।

আধ-পাকা রাস্তা। দুই পাশে বিস্তৃত তৃণহীন কঙ্করময় প্রান্তর, মাঝে মাঝে কুল ও বাবলার ঝোপ, দূর দিগন্তে অস্পষ্ট তরুশ্রেণীর মাথার উপর কলিয়ারির চিমনি হইতে ধূমরেখা সাপের মত কুণ্ডলী পাকাইয়া পাকাইয়া ঊর্দ্ধে উঠিতেছে। পশ্চিম দিকপ্রান্তে একটি সুদূরবর্ত্তী পাহাড় বিশাল নীল মেঘের মত স্থির হইয়া আছে।

মনোজ চিন্তাকুল মুখে সুধার কথা ভাবিতেছিল। প্রায় এক মাস হইল, দেখি নাই। যাইবার জন্য কত মিনতি করিয়া চিঠি লিখিয়াছে। লিখিয়াছে, ভয় করিতেছে। কি হইয়াছে, কে জানে! চিঠিটা বোধ

হয় পাইয়াছে। সান্ত্বনা তো দিয়াছি, কিন্তু বাবা-মায়ের মত কোন দিন হইবে বলিয়া মনে হয় না। না হউক, সকলের অমতেই বিবাহ করিব। ভাল করিয়া পাস করিতে পারিলে, আর কিছু না হউক, একটা প্রফেসারি জুটিবে, কলিকাতায় একটি ছোট বাড়ি লইয়া সুধাকে লইয়া সংসার পাতিব। যদি কোন দিন বড় হইতে পারি, অনেক টাকা রোজগার করিতে পারি, মা-বাবার ভালবাসা ফিরিয়া পাইতে দেরি হইবে না।

একটি ছোট গ্রামের মধ্য দিয়া যাইতে হইল। একটি গ্রাম্য বধূ কলস-কক্ষে পুকুর হইতে জল লইয়া ফিরিতেছিল। মনোজকে দেখিয়া ঘোমটা টানিল। কিন্তু ঘোমটার ফাঁক দিয়া মনোজ তাহার সুন্দর মুখখানি দেখিতে পাইল, ঠিক সুধার মত মুখের চেহারা। পৃথিবীতে সব মেয়ের চেহারাই এক নাকি! সুধার সহিত পরিচয় হইবার পর মনোজ যেখানে যত মেয়ে দেখিয়াছে, সকলের মুখেই সুধার মুখের আদল দেখিতে পাইয়াছে।

গ্রামটি পার হইতেই রেলপথটি পাশে পড়িল। রেলপথের ধারে উলঙ্গ রাখাল-ছেলেরা গরু চরাইতেছিল। কিছু দূর যাইয়া রেলরাস্তাটি পার হইতে হইল। গেট বন্ধ ছিল। জমিদারের নাম শুনিতেই গেট খুলিয়া গেল। তারপর কিছু দূর গিয়াই একটা বড় আম-বাগান, তার পরেই একটা প্রকাণ্ড দীঘি, তাহা পার হইলেই নূতন জমিদারের নব-নির্ম্মিত ত্রিতল অট্টালিকা চোখে পড়িল।

কাছারি-বাড়ির সামনে আসিয়া গরুর গাড়ি থামিতেই শৈলজা-মামা প্রকাণ্ড গোল-আলুর মত মুখে এক গাল হাসিয়া চটিজুতা ফটফট করিতে করিতে আসিয়া হাজির হইল, কহিল, এসেছিস? হেঁটে এলি যে?

মনোজ শৈলজাকে প্রণাম করিয়া কহিল, আপনার গাড়োয়ানের দোষ নেই, ও বেচারা টানাটানির ত্রুটি করে নি।

শৈলজা গাড়োয়ানটাকে বাক্স বিছানা যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিতে আদেশ দিয়া মনোজকে বলিল, আয়।

কাছারি-বাড়িটি দোতলা। অনেক দিনের পুরাতন বাড়ি। পূর্ব্বে জমিদারের এইটিই বাসগৃহ ছিল। এখন একতলায় কাছারি ও দোতলায় ম্যানেজারের বাসা হইয়াছে। নূতন জমিদার নিজের মনের মত নূতন বাড়ি তৈয়ারি করিয়াছেন।

বিকালবেলায় শৈলজা কহিল, জমিদার-গিন্নীর সঙ্গে দেখা ক'রে আসবি চল্, অনেক ক'রে বলেছেন।

মনোজ কহিল, কি দরকার?

বারে! তা কি হয়! তুই না হয় চাকরি করিস না, তবু তাঁর বাড়িতে এসেছিস, ভদ্রতার খাতিরেও দেখা করা উচিত। তা ছাড়া খুব স্নেহ করেন আমাকে, নিজের লোকের মত।

জমিদার-বাড়িতে ঢুকিতেই ম্যানেজারবাবুকে দেখিয়া ঝি-চাকর সকলেই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। একজন চাকর সসম্মানে তাহাদিগকে দোতলার একটা ঘরে লইয়া গিয়া বসাইল। মনোজ লক্ষ্য করিল, তাহাকে দেখিয়া সকলেরই, বিশেষ করিয়া ঝিগুলার মধ্যে, কিসের ইঙ্গিত চোখে চোখে চলাচল করিতেছে।

কিছুক্ষণ পরে জমিদার-গৃহিণী সুরবালা কক্ষে প্রবেশ করিলেন। শৈলজা উঠিয়া দাঁড়াইল এবং হাতে ধরিয়া টানিয়া মনোজকে দাঁড় করাইয়া দিল। ফিসফিস করিয়া কহিল, প্রণাম করবি, ঠিক আমার মত ক'রে।

সুরবালা কাছে আসিতেই শৈলজা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল এবং উঠিয়া দাঁড়াইয়া মনোজকে কহিল, প্রণাম কর্ বাবা। ইনিই আমাদের—। বলিয়া মনোজকে ঘাড়ে ধরিয়া প্রণাম করাইল।

সুরবালা মনোজের মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, এইটিই ঘনশ্যামবাবুর ছেলে ?

হাত কচলাইতে কচলাইতে শৈলজা কহিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, এর কথাই বলেছিলাম আপনাকে। এম. এ. পরীক্ষা দিয়ে বেড়াতে এসেছে।

মনোজকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া সুরবালা কহিলেন, বেশ করেছ বাবা। ভারি সুখী হলাম তোমাকে দেখে। তোমার কথা তোমার মামাবাবুর কাছে অনেক দিন থেকে শুনেছি। পরীক্ষা বেশ হয়েছে তো ?

মনোজ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

সুরবালা কহিলেন, এবারেও জলপানি, সোনার মেডেল পাবে তো ?

মনোজ মুখ লাল করিয়া কহিল, ঠিক বলতে পারি না।

সুরবালা কহিলেন, ঠিক পাবে তুমি, আমি আশীর্ব্বাদ করছি। তা ছাড়া বরাবর তো পেয়েছ। তোমার মামাবাবু বলছিলেন, মেডেলের নাকি মালা হয়ে গেছে !

মনোজ শৈলজার দিকে কটাক্ষ হানিল, শৈলজা নির্ব্বিকারভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

শৈলজাকে উদ্দেশ করিয়া সুরবালা কহিলেন, তোমরা একটু ব'স, আমি আসছি।

শৈলজা কহিল, থাক থাক, এখন আর কেন ?

সুরবালা বাধা দিয়া কহিলেন, তা কি হয় ! আজ প্রথম দিন ছেলে মায়ের বাড়িতে পা দিয়েছে, একটু মিষ্টি-মুখ করবে না ?—বলিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন।

রাত্রে মনোজ শৈলজাকে কহিল, বাবা বলছিলেন, জমিদারির কি সব কাজ আমাকে করতে হবে। কালই একটা কাজের ফিরিস্তি দেবেন।

যত শিগগির পারি কাজ সেরে আমাকে কলকাতা ফিরতে হবে, বিশেষ কাজ—

শৈলজা মনে মনে হাসিয়া কহিল, বিশেষ কাজটা কি ?

মানে কলেজ-সংক্রান্ত কাজ। দু-চারজন প্রফেসারের সঙ্গে দেখা করতে হবে। তা ছাড়া আবার ল পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে।

ওঃ, বুঝেছি। তা বাবাজী, কাজ তো জঞ্জালের মত জমা হয়ে নেই যে, এক মিনিটেই ঝাঁট দিয়ে সাফ ক'রে দেবে। দিনের পর দিন কাজ আসবে। কাজেই, এত শিগগির তোমার যাওয়া হয়ে উঠবে ব'লে মনে হয় না।

মনোজ বিরক্ত মুখে কহিল, দিনের পর দিন যদি কাজ আসে, আর তাই যদি আমাকে সারতে হয়, তা হ'লে তো এখানে সারাজীবন থেকে যেতে হবে।

শৈলজা মৃদু হাসিয়া কহিল, সারাজীবন না হোক, মাস দুই তো বটেই।

মনোজ ধারালো কণ্ঠে কহিল, দু মাস আমি থাকতে পারব না মামা, আপনি বরং বাবাকে আসতে লিখুন।

পাগল! তাঁর এই শরীরে কি আসতে বলা যায় ?

মনোজ বিরস মুখে বসিয়া রহিল। শৈলজা বলিতে লাগিল, পাড়াগাঁয়ে তো কখনও থাকিস নি, তাই মনটা ও রকম ছটফট করছে। দিন কয়েক থাকলেই মন ব'সে যাবে। তখন আবার এখান থেকে যেতে ইচ্ছে করবে না। আমাকেই দেখ্ না, তোর মামীকে ছেড়ে এক পা নড়তে পারতাম না, কিন্তু আজ দু মাস দিব্যি টিকে রয়েছি।

মনোজ নীরব রহিল। শৈলজা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিতে লাগিল, জমিদারির কাজ এখন হয়তো তোর ভাল লাগবে না। মনটা

একটু বসুক, তারপর করবি। এখন আমার একটি কাজ ক'রে দে দেখি।

মনোজ উৎসুক কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, কি কাজ ?

কাজ এমন কিছু শক্ত না, তবে আমি সময় ক'রে উঠতে পারছি না ব'লে বেশ সুবিধে হচ্ছে না। মানে, জমিদারের মেয়েটিকে রোজ সকালে পড়াতে হয়, বেশিক্ষণ নয়, মাত্র ঘণ্টাখানেক, তা তুই বরং সম্প্রতি এই কাজটাই কর্, আমি অন্যগুলো দেখি।

মনোজ প্রবল বেগে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না মামা। মেয়েমানুষ পড়ানো আমার কর্ম্ম নয়।

শৈলজা দুই চোখ ডাগর করিয়া কহিল, আরে! মেয়েমানুষ আবার কি! নেহাত বাচ্চা মেয়ে।

মনোজ কহিল, তা হোক, জমিদারির কাজই আমার ভাল, আপনি নিজে ওসব করুনগে।

শৈলজা মুরুব্বিয়ানার সহিত মৃদু হাসিয়া কহিল, পাগল আর কাকে বলে! এম. এ. পাস ক'রে একটা দুধের মেয়েকে দু পাতা ইংরিজী পড়াতে পারবি না? বেশ, একদিন গিয়ে দেখ্ তো, যদি ভাল না লাগে, তখন ছেড়ে দিবি।

তার পরদিন সকালে শৈলজা নিজে মনোজকে সঙ্গে করিয়া জমিদার-বাড়ি লইয়া গেল এবং পড়িবার ঘরে তাহাকে বসাইয়া কহিল, ব'স্, মা লক্ষ্মীকে পাঠিয়ে দিতে বলিগে।—বলিয়া অন্দরের মধ্যে চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে সুরবালা সকন্যা প্রবেশ করিলেন। কিন্তু দুধের মেয়ে তো নয়। বয়স পনরোর চেয়ে বেশি, ফরসা রঙ, বাড়ন্ত গড়ন; মুখের গঠন সুশ্রী, কিন্তু ভাব সুধার মত কোমল নয়। ধনীতনয়াসুলভ অহঙ্কারের প্রলেপ সারা মুখে পুরু হইয়া বসিয়া মুখের স্বাভাবিক পেলবতাকে

যেন ঢাকিয়া রাখিয়াছে। চোখ দুইটি বড় না হইলেও, সুন্দর; দৃষ্টি চতুর ও চটুল; সুদূর আকাশে উড়ন্ত চিলের ডানার মত দুইটি ভ্রূ। ঠোঁট দুইটি পাতলা ও ঈষৎ কুঞ্চিত। পরিধানে রঙিন শাড়ি, সর্ব্বাঙ্গে সোনার গহনা। এই বেশে পাঠকক্ষে প্রবেশ না করিয়া বিবাহ-সভায় প্রবেশ করা চলিত।

মেয়েটি ঘরে ঢুকিয়া মনোজের দিকে চট করিয়া এক চোখ চাহিয়া লইয়া মাথা নীচু করিল; মুখে চাপা হাসি, বোধ করি, ক্ষণেকের জন্য ফুটিয়া উঠিল। তারপর ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া সুরবালার পিছু পিছু আসিতে লাগিল। মনোজ লক্ষ্য করিল, একজন ঝি দরজার ফাঁক দিয়া মুখ বাড়াইয়া, মুখ টিপিয়া হাসিয়া আবার সরিয়া গেল।

মেয়েকে চেয়ারে বসাইয়া সুরবালা কহিলেন, এইটি, বাবা, আমার মেয়ে, একমাত্র মেয়ে, আর আমার কেউ নেই। লেখাপড়া বেশি কিছু শেখে নি। শৈলজাবাবু পড়াচ্ছিলেন। উনি তো আবার সব দিন সময় পান না। তা বাবা, তোমার হাতেই দিচ্ছি, একটু শিখিয়ে পড়িয়ে নাও।

মনোজ শুষ্ক স্বরে জবাব দিল, আমি আর কদিন পড়াতে পারব? বেশি দিন তো থাকব না এখানে।

সুরবালা কহিলেন, যে কদিন পার বাবা। তোমার মত পণ্ডিতের কাছে দুদিন পড়লেই মেয়ে আমার অনেক শিখতে পারবে। মেয়েকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, আমি যাচ্ছি, তুই বেশ মন দিয়ে পড়্ মা। লজ্জা কিসের? তোর শৈলজা-মামার নিজের ভাগনে, আপনার লোক।

সুরবালা প্রস্থান করিলেন, না দরজার কাছে আড়ি পাতিতে লাগিলেন, বুঝা গেল না। কিন্তু মেয়েটি মুখ গোঁজ করিয়া কঠিনভাবে বসিয়া রহিল। মনোজ টেবিল হইতে একটি বই টানিয়া লইল, ইংরেজী ফার্স্ট বুক, বইয়ের

প্রথম পাতায় নাম লেখা রহিয়াছে—মাধুরী। মনোজ মনে মনে কহিল, নাম আবার মাধুরী! চেহারা তো মোটেই মধুর বলিয়া মনে হইতেছে না; বরং টক। নাম 'মাধুরী' না হইয়া 'তিন্তিড়ী' হওয়া উচিত ছিল। বইটির দুই-চার পাতা খুলিয়া মনোজ জিজ্ঞাসা করিল, কত দূর পড়েছ?

মেয়েটি একবার তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া চোখ নামাইয়া ধীরে ধীরে কহিল, ভেড়ার পাতা পর্য্যন্ত।

মনোজ ছাত্রীর কঠিন ভাবটিকে কিঞ্চিৎ কোমল করিবার জন্য প্রশ্ন করিল, ভেড়া দেখেছ?

মাধুরী চকিতে একবার চাহিয়া ফিক করিয়া হাসিয়া কহিল, হুঁ।

ভেড়ার কতগুলো শিঙ আছে, বল দেখি?

মাধুরী কহিল, আমাদের দেশে ভেড়ার দুটোর বেশি শিঙ থাকে না। আপনাদের দেশে বুঝি আরও বেশি থাকে?

ছাত্রী আশাতিরিক্ত কোমল হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া মনোজ গম্ভীর হইয়া কহিল, না। আচ্ছা, ভেড়ার কি ইংরিজী, বল দেখি?

ঠোঁট উল্টাইয়া মাধুরী জবাব দিল, জানি না।

ভেড়ার ইংরিজী—Ram; বল—The ram মানে ভেড়াটি।

মাধুরী কহিল, আপনি ব'লে যান, আমি প'ড়ে বলব 'খন।

বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া মনোজ সাফ জবাব দিল, আমার এ পোষাবে না। বাবা! কি দেমাকী মেয়ে! অহঙ্কারে যেন ফেটে পড়ছে! কিছুতেই আর বলাতে পারলাম না!

শৈলজা কহিল, দূর! তুই চিনতে পারিস নি। ভারি ভাল মেয়ে। প্রথম দিন কিনা, তাই লজ্জা করেছে। এর পর দেখবি।

আর আমার দেখে কাজ নেই মামা। আপনার ছাত্রী আপনাকেই ভাল—

না বাবাজী, তা বললে হবে না। অন্তত গরিব মামার ওপর দয়া ক'রেও কাজটি তোকে করতে হবে।

মনোজ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, এখানে পোস্ট-আফিস নেই ?

শৈলজা সন্দিগ্ধ স্বরে কহিল, কেন বল্ দেখি ? জামাইবাবুকে চিঠি দিবি নাকি ?

মনোজ ঢোক গিলিয়া কহিল, হঁ্যা।

শৈলজা জবাব দিল, পোস্ট-আফিস তো আমাদের এখানে নেই। আছে বলরামপুরে, এখান থেকে মাইল তিন দূর। যে জমিদারের সঙ্গে আমাদের মামলা চলছিল, তাদের বাড়ি সেই গাঁয়ে। আমাদের এখানে পোস্ট-আফিস করবার চেষ্টা করছি আমরা।

একবার যেতে হবে আজ বিকেলে।

শৈলজা হাত নাড়িয়া কহিল, না না, ওখানে যাস নি। যদি জানতে পারে, হয়তো অপমান ক'রে দেবে। বলা তো যায় না। তা তোর চিঠি লেখার থাকে তো লিখে রাখ্। আমাদের লোক রোজ যায়। ফেলে দিয়ে আসবে এখন।

আর যদি কোন চিঠি আসে ?

তাও এনে দেবে।

পরের দিন পড়াইতে গিয়া মনোজ দেখিল, মাধুরী পড়াশুনা কিছুই তৈয়ারি করে নাই। জিজ্ঞাসা করিতে বলিল, সময় ছিল না।

মনোজ বিস্ময়ের সহিত প্রশ্ন করিল, সময় ছিল না ? কি এমন কাজ করছিলে ?

মাধুরী তাচ্ছিল্যের সহিত কহিল, কাজ আবার কি? এমনিই।—বলিয়া ঠোঁট কুঁচকাইল।

মনোজ কঠিন কণ্ঠে কহিল, এমনিই যদি সময় না পাও তো পড়াশুনা ছেড়ে দিলেই পার।

মাধুরী জবাব দিল না। মনোজ কহিল, তোমার সময়ের দাম না থাকতে পারে, আমার আছে। কাল থেকে আমি আসতে পারব না, তোমার মাকে ব'লো।

সুরবালা কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কহিলেন, কাল আমাদের এক বড় প্রজার বাড়িতে নেমন্তন্ন ছিল। সারাদিন সেখানে কাটাতে হ'ল। মেয়ে আমার কাল কিছু পড়তে পারে নি। আসতে চাইছিল না, তুমি বকবে ব'লে। আজকের মত কিছু একে ব'লো না বাবা।

সুরবালা চলিয়া গেলে মনোজ কহিল, আমাকে বললেই পারতে। মিথ্যে রাগ ধরিয়ে দিলে।

মাধুরী ম্লান মুখে জবাব দিল, আপনি এত রাগবেন, জানব কি ক'রে?

সেদিন পড়াশুনায় বিশেষ গোলযোগ হইল না। দিন কয়েক পরে মাধুরী একটা শক্ত শব্দ কিছুতেই স্পষ্ট উচ্চারণ করিতে পারিতেছিল না। মনোজ বিরক্ত হইয়া কহিল, এত পান খাও কেন? দাঁতে জিবে এক ইঞ্চি পুরু পানের ছোপ, উচ্চারণ হবে কি ক'রে?

নীরস স্বরে মাধুরী কহিল, উচ্চারণ হয়ে কাজ নেই। পান ছাড়তে আমি পারব না।

বইটি সরাইয়া দিয়া মনোজ কহিল, বেশ, তা হ'লে পড়াশুনা বন্ধ থাক।

মাধুরী কহিল, বেশ তো।—বলিয়া তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া গটগট করিয়া বাহির হইয়া গেল। মনোজ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া চলিয়া আসিল।

মাধুরীকে পড়াইবার সময়ে মনোজের সুধার কথা মনে পড়ে। কত বুদ্ধি! কত মনোযোগ! কত শ্রদ্ধা! পড়াইয়া সাধ মিটিত না। মাধুরীকে কিছুক্ষণ পড়াইতে না পড়াইতেই মন ক্লান্ত হইয়া আসে।

সেই দিন বিকালে শৈলজা দেখা করিতে গেলে সুরবালা কহিলেন, ছেলেটির মেজাজ ভাল নয়।

শৈলজা প্রবল প্রতিবাদ করিয়া কহিল, কে বললে আপনাকে? চমৎকার মেজাজ। ভারি আমুদে। তবে বাড়ি থেকে কদিন মাত্র এসেছে কিনা। তা ছাড়া জামাইবাবুর অসুখ দেখে এসেছে, তাই মনটা একটু খিঁচড়ে আছে। তার ওপর পরীক্ষার খবর এখনও পায় নি, বাবাজীর তো শুধু ফার্স্ট হ'লেই চলবে না, একশোর মধ্যে একশোই পাওয়া চাই। কিছু ভাববেন না আপনি।

সুরবালা কহিলেন, মেয়ে নাকি পান খায় ব'লে ধমকেছে!

শৈলজা যেন আকাশ হইতে পড়িল; কহিল, ধমকেছে! ধমকাবার ছেলে তো ও নয়। মা লক্ষ্মী বোধ হয় বুঝতে পারে নি।

সুরবালা কহিলেন, মা লক্ষ্মী তোমার ঠিক বুঝেছে। আজ সারাদিন একটি পান মুখে দেয় নি।

শৈলজা এক গাল হাসিয়া কহিল, তা হ'লে তো বাবাজীকে মা লক্ষ্মীর—

সুরবালা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, হয়তো ভাল লেগেছে। কিন্তু তোমার বাবাজীটির ভাল লাগবে কি ক'রে? ও রকম শুধু পড়ালে হবে না। দুজনে একসঙ্গে বেড়াবার ব্যবস্থা কর, তুমি বরং নিজে সঙ্গে যেয়ো।

শৈলজা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, বেশ, তাই হবে।

তার পরদিন মনোজকে টানা-হেঁচড়া করিয়া পাঠাইতে হইল। কিন্তু সেদিন মনোজের মন্দ লাগিল না। মাধুরীর দাঁতগুলি মুক্তার মত ঝকঝক

করিতেছে, এবং যে শব্দটি কাল এত চেষ্টা করিয়াও সে উচ্চারণ করিতে পারে নাই, আজ সেটি সে নিজের চেষ্টাতেই ভাল করিয়া উচ্চারণ করিতে পারিল। মনোজ জিজ্ঞাসা করিল, আজ পান খাও নি?

মাধুরী গম্ভীর মুখে জবাব দিল, না, পান ছেড়ে দিয়েছি।

মনোজ কহিল, একেবারে ছাড়তে তো বলি নি, বেশি খেয়ো না।

জবাব না দিয়া মাধুরী শুধু ঠোঁট ফুলাইল।

বিকালবেলায় শৈলজা মনোজকে কহিল, চল্, বেড়িয়ে আসি।

জমিদার-বাড়ির পাশ দিয়া যে কাঁচা রাস্তাটি গ্রাম পার হইয়া বরাবর ক্ষুদে নদীর ঘাট পর্য্যন্ত গিয়াছে, শৈলজা ও মনোজ সেই রাস্তা দিয়া চলিল। জমিদার-বাড়ির কাছে আসিয়া শৈলজা কহিল, তুই একটু দাঁড়া, আমি এখনই আসছি। এবং মনোজকে প্রতিবাদের অবসর না দিয়া দ্রুতপদে জমিদার-বাড়ির দিকে প্রস্থান করিল।

কিছুক্ষণ পরে শৈলজা ফিরিয়া আসিল, কিন্তু একা নহে, সঙ্গে মাধুরী। মাধুরী ছাই রঙের বুটিদার ঢাকাই শাড়ি পরিয়াছে, গায়ে গাঢ় নীল রঙের সাটিনের ব্লাউজ়। ঝকঝকে পালিশ করা নূতন সেটের গহনা সর্ব্বাঙ্গে ঝলমল করিতেছে। পায়ে আনকোরা নূতন হিল-তোলা জুতা পরিয়া মাধুরী শৈলজার পাছু পাছু খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া আসিতেছে।

মনোজ মনে মনে কহিল, সারাদেহে তো সোনায় মুড়িয়া মাছি বসিবার পর্য্যন্ত জায়গা রাখে নাই, শুধু পা দুইটি বাকি কেন? কয়েক-গাছি করিয়া মল ও পাঁইজর পরিলেই পারিত, হিল-তোলা জুতার সঙ্গে মানাইত ভাল! কিন্তু শৈলজা-মামার মতলবটা কি? এই জীবটিকে টানিয়া আনা হইল কেন? পায়ে ফোস্কা পড়িয়া যদি চলিতে না পারে তো কোলে তুলিবে কে? মামা নিজে, না সে? মনোজ কটাক্ষে মাধুরীর দিকে তাকাইয়া দেখিল, অস্তগামী সূর্য্যের লাল আলো

পড়িয়া তাহার মুখ টকটকে রাঙা হইয়া উঠিয়াছে ; কানের দুল দুইটি যেন আগুনের তৈয়ারি। ব্লাউজের অবকাশে বুক ও হাতের যতটুকু দেখা যাইতেছে, পালিশ করা শ্বেত পাথরের মত চকচক করিতেছে। মাধুরীর মাধুর্য্য না থাক, সৌন্দর্য্য আছে, বোধ হয় সুধার চেয়েও বেশি ; বার বার তাকাইয়া দেখিতে ইচ্ছা করে।

ক্ষুদে নদীটি সত্যই ক্ষুদ্রকায়। পৃথিবীতে অন্তত ইহার নামের সহিত চেহারার কিছুমাত্র গরমিল নাই। বৎসরের অধিকাংশ সময়েই জল থাকে না, শুধু বর্ষাকালে মাঝে মাঝে ঢল নামে ; গেরুয়া রঙের জল দুই তীর উপচাইয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত আগাইয়া যায়। এখনও বেশি জল ছিল না, শুধু একটি ক্ষীণ প্রবাহ এক পাশ ঘেঁষিয়া বহিতেছিল। নদীর বুকে বড় বড় পাথরের চাংড়া এখানে ওখানে পড়িয়া আছে। শৈলজা এতটা রাস্তা হাঁটিয়া আসিয়া হাঁপাইতেছিল। একটা পাথরের উপর বসিয়া পড়িয়া মাধুরীকে কহিল, এইখানে ব'স মা। মনোজকে কহিল, তুই ওইখানটায় ব'স্।

মনোজ না বসিয়া একটা পাথরের উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া ওপারের দিকে তাকাইয়া রহিল।

ওপারে খাড়া উঁচু পাড় বর্ষার সময়ে স্রোতের তাড়নায় ভাঙিয়া-চুরিয়া গিয়াছে। পায়ে-চলা সরু পথ নদীর বুক হইতে পাড় বাহিয়া উঠিয়া, ওপারে অনেক দূর গিয়া বোধ হয় ওই দূরের গ্রামটিতে পৌঁছিয়াছে। নদীর ধার হইতে একটু দূরে পথের পাশেই একটা উঁচু ঢিপি ; তাহার উপর একটা কাঠের অথবা পাথরের ক্রস পোঁতা রহিয়াছে। সেই দিকে হাত বাড়াইয়া মনোজ কহিল, ওটা কি মামা ?

সুধার প্রেম

শৈলজা

ওটা এক সা

মনোজ

শৈলজা

এখানে একটি

বনের আমদা

বড় আর ছোট

বড় বড় বন্দুক

তো ; দেখবামাত্র স

দাঁত বের ক'রে হে

দিলে। শেষে একজন

ঝোপের মধ্যে বাঘটা

বন্দুক বাগিয়ে চললেন এগি

অমনই জুতোর শব্দ পেয়ে

মানুষ, বিশেষ ক'রে সাহেব, দে

গড়াতে লাগল। তাই দেখে

ক'রে কাঁপতে লাগলেন, আর কোম

ডাকতে লাগলেন। বাঘটা বার দুই

চেটে, এক লাফে বড় সাহেবের ওপর

চোঁ-চোঁ ক'রে ছুটল। তাই দেখে

গড়িয়ে পড়লেন। হৈ-হৈ রৈ-রৈ ছু

না, কিন্তু সাহেবের তল্লাস পাওয়া গে

ক্রোশ পাঁচেক দূরে একটা জঙ্গলের মধ্যে

কতকগুলো হাড়গোড় খুঁজে পাওয়া গেল

কেঁদেছিল।

আর বিয়ে

মীর কাছে

বরে দেবার

সি।—বলিয়া

পচুপি কহিল,

রে এতখানি হেঁটে

রয়া কহিল, ওরে!

রী জুতা খুলিয়া ফেলিয়া

।

য়ে মাধুরীর কষ্ট হইতেছিল।

হাতটা ধর্, প'ড়ে যাবে যে।

হল, কি ক'রে ধরি? হাতে কি

নাজের মুখের দিকে তাকাইল।

ফরাইল, এবং অন্যমনস্ক হওয়ার জন্য

মনোজ তাড়াতাড়ি কাছে সরিয়া

া কহিল, প'ড়ে যাবে যে। এত গয়না

না, কিন্তু মনোজ বুঝিতে পারিল,

'লর

ত চলিতে মনোজ কহিল, এই পথ দিয়েক্কে

যা

মাধুরী ঘাড় নাড়িল।

ওই গাঁয়ে কখনও গেছ ?

মাধুরী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, গিয়াছে।

মনোজ কহিল, কথা কইতে বুঝি কষ্ট হচ্ছে ?

মাধুরী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না।

তবে শুধু ঘাড় নাড়ছ কেন ? ওঃ, লজ্জা ! এত লজ্জা তো বেড়াতে এলেই পারতে।

মাধুরী থমকিয়া দাঁড়াইল। মনোজ কহিল, ও কি ! দাঁড়ালে যে ?

মাধুরী কহিল, আমি যাব না, ফিরে যাই।

বিস্ময়ের স্বরে মনোজ কহিল, কেন ?

মাধুরী অভিমানের সহিত কহিল, আপনি মানা করছেন যে।

মনোজ অপ্রতিভ হইয়া কহিল, মানা করলুম কখন ? তুমি কথা লছিলে না ব'লে আমি ও কথা বললাম। দুদিনের জন্যে হ'লেও আমার াত্রী তুমি, আমার কাছে এত লজ্জা করবার তোমার কোন কারণ নেই।

মাধুরী আবার চলিতে লাগিল।

মনোজ কহিল, ওই গাঁয়ে কি তোমাদের কোন আত্মীয় আছেন ?

মাধুরী কহিল, না, আমার সইয়ের বাড়ি ওখানে। সইয়ের বাবা মামাদের প্রজা।

কবরের উপরটা সিমেণ্ট দিয়া বাঁধানো। তাহার উপর বেশ মজবুত কাঠের তৈয়ারি একটি ক্রস, আলকাতরা মাখানো।

কবরটির দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া মনোজ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, কোথায় কার মাটি কেনা থাকে, কেউ বলতে পারে না। কোথায় সাত সমুদ্দুর পারে ইংলণ্ডের এক ছোট্ট গাঁয়ে হয়তো জন্মেছিল, তার মরল এসে বাংলা দেশের এক প্রান্তে এক তেপান্তর মাঠের মধ্যে।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, আমিই ধর না, কোথায় জন্মেছি, আর মরব হয়তো তোমাদের গাঁয়ে, না মাধুরী?

মাধুরী একবার কটাক্ষে মনোজের দিকে চাহিল।

মনোজ বলিতে লাগিল, সত্যি, কিছু বলা যায় না। আজ তোমার সঙ্গে বেড়াচ্ছি, কাল হয়তো সকালে শুনবে, ম'রে গেছি। আমার তো আর কবর হবে না, সবাই মিলে ধরাধরি ক'রে এনে নদীর ধারে পুড়িয়ে দেবে। কোন চিহ্নই থাকবে না, শুধু প'ড়ে থাকবে কতকগুলো পোড়া কাঠ আর কয়লা। তাও একদিন ঢল নেমে সব ধুয়ে মুছে সাফ ক'রে দেবে। তুমি হয়তো কোন দিন বেড়াতে এসে হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে বলবে, ওইখানটায়—

মাধুরী সকোপে কহিল, চুপ করুন, ভাল লাগছে না আমার।

মনোজ কহিল, ওঃ, ভাল লাগছে না তোমার! আচ্ছা, চল তা হ'লে, ফেরা যাক।

সূর্য্য অস্ত গিয়াছিল, একদল কাক কা-কা শব্দ করিয়া দূরের গ্রামটির দিকে ফিরিতেছিল, দিগন্তে অন্ধকার নামিতে শুরু করিয়াছিল।

ফিরিয়া আসিয়া মাধুরী ভিজা পায়ে জুতা না পরিয়া শৈলজাকে কহিল, জুতো দুটো হাতে ক'রে নিয়ে যাই, পা কেটে গেছে।

শৈলজা ব্যস্ত হইয়া কহিল, পা কেটে গেছে! নতুন জুতো কিনা। তা, মা, তোমাকে নিয়ে যেতে হবে কেন? মনোজকে কহিল, তুইই নে বাবা। তারপর মনোজকে ইতস্তত করিতে দেখিয়া কহিল, যেই হোক, লেডি তো। চোখের সামনে তাকে জুতো বইয়ে শিভাল্‌রির শ্রাদ্ধ করিস নি বাবা।

মাধুরী অসঙ্কোচে জুতা দুইটি হাতে তুলিয়া দিতেই মনোজ বিরক্ত মুখে কহিল, অনভ্যাসের ফোঁটা পরা কেন? মুশকিল!

মনোজ লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইত, মাধুরী মুচকি মুচকি হাসিতেছে।

শৈলজা বাড়ি ফিরিয়া সুরবালার কাছে রিপোর্ট করিল, দুইজনে কবর পর্য্যন্ত বেড়াইতে গিয়াছিল; মনোজ হাত ধরিয়া মাধুরীকে পাড়ে উঠাইয়াছিল এবং ফিরিবার সময় সারা রাস্তা মাধুরীর জুতা বহিয়া আনিয়াছিল।

রাত্রে শুইয়া মাধুরীর কথাই মনোজের আগে মনে হইল, তাহার আগুনের মত রাঙা টকটকে মুখ, মাখনের মত কোমল স্পর্শ, বিদ্যুৎ-চমকের মত সকোপ কটাক্ষ। কিন্তু জোর করিয়া তাহা সরাইয়া দিয়া মনোজ সুধার কথা ভাবিতে লাগিল। সুধার চিঠি কাল নিশ্চয় আসিবে। সুধা এতক্ষণ কি করিতেছে, কে জানে! হয়তো তাহার ছোট্ট বিছানাটিতে শুইয়া তাহারই কথা ভাবিতেছে। পরীক্ষার ফল বাহির হইলেই সে সুধাকে বিবাহ করিবে। তাহাতে বাবা-মার মত হউক আর নাই হউক। হৃদয়কে উপবাসী রাখিয়া পিতৃভক্তি দেখাইতে আর যেই পারুক, সে পারিবে না। তাহা ছাড়া সুধা তো কাহারও মুখের পানে তাকায় নাই, কোন দ্বিধা করে নাই, নির্ব্বিচারে নিজেকে নিঃশেষে তাহার হাতে তুলিয়া দিয়াছে। সেই বা কেন, সুকৃতি ও সুনামের মোহে, পিতামাতার স্বার্থসিদ্ধির জন্য, তাহাকে বুকে না তুলিয়া পায়ে ঠেলিবে?

তার পরদিন মনোজকে ঠেলিয়া পাঠাইতে হইল না। পড়িবার ঘরে যাইয়া বসিতেই সুরবালা প্রবেশ করিলেন, হাতে এক থালা খাবার। তাঁহার পিছনে একজন ঝি, তাহার বাম হাতে এক গ্লাস জল, ডান হাতে এক কাপ ধূমায়িত চা।

মনোজ কহিল, এ আবার কেন? এইমাত্র খেয়ে আসছি।

সুরবালা সস্নেহে কহিলেন, তা হোক বাবা, খাও।—বলিয়া বাম হাত

দিয়া ঘোমটাটি একটু টানিলেন। থালা নামাইয়া দিয়া কহিলেন, এখানে কেমন লাগছে বাবা?

মনোজ খাইতে খাইতে কহিল, ভালই লাগছে।

সুরবালা কণ্ঠস্বর কোমল করিয়া কহিলেন, তা হ'লে বাবা, দিন কয়েক থেকেই যাও, আমাদেরও তো দেখতে ইচ্ছে করে।

হঠাৎ সুরবালার যে তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে কেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়া মনোজ চুপ করিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে মাধুরী আসিল। পরিধানে জরিপাড় সাদা ফরাসডাঙার শাড়ি, গায়ে সাদা সিল্কের ব্লাউজ; গলায় একগাছি সরু বিছাহার ও হাতে চারগাছি করিয়া চুড়ি ছাড়া গায়ে আর কোন গহনা নাই।

মনোজ সবিস্ময়ে কহিল, গায়ের এত গয়না কি হ'ল?

মাধুরী গম্ভীরভাবে জবাব দিল, খুলে ফেলেছি।

মনোজ প্রশ্ন করিল, হঠাৎ খুলে ফেললে কেন?

ভুরু কুঁচকাইয়া মাধুরী কহিল, বারে! আপনি যে কাল মানা করলেন।

মনোজ সন্ত্রস্ত হইয়া কহিল, আমার কথা শুনে তুমি খুলে ফেলেছ? না না, ওসব ক'রো না, তোমার মা আবার রাগ করবেন। ভাববেন, কোথাকার কে, দুদিন পড়াতে এসে তাঁর মেয়ের ওপর অযথা উপদ্রব করছে।

মাধুরী মুচকি হাসিয়া কহিল, আপনি আমার গুরু যে, আপনার কথা শুনলে মা রাগ করবেন না।

মনোজ ব্যঙ্গের স্বরে কহিল, বল কি! এত গুরুভক্তি! কাল তো জুতো জোড়াটি স্বচ্ছন্দে হাতে তুলে দিলে!

মাধুরী হাসি চাপিয়া কহিল, তা কি করব? মামাবাবু বললেন যে।

চোখ ডাগর করিয়া মনোজ কহিল, ওঃ, তথা মাতুলভক্তি!

সেদিনও সুধার চিঠি আসিল না। মনোজ শৈলজাকে কহিল, আপনার তো কাজকর্ম্ম বিশেষ কিছু নেই দেখছি, আর থাকলেও আমার সাহায্যের দরকার হবে ব'লে মনে হচ্ছে না। তা হ'লে আমি শুধু শুধু এখানে ব'সে থেকে কি করব? আমি বরং—

শৈলজা বাধা দিয়া কহিল, মাধুরীকে পড়ানোটা বুঝি আমার কাজ নয়?

মনোজ বিরক্ত হইয়া কহিল, সেজন্যে আমার এখানে ব'সে থাকবার দরকার দেখছি না।

শৈলজা বিস্মিত স্বরে কহিল, দরকার দেখছিস না মানে?

মানে আর কি? ও কাজ যাকে তাকে দিয়ে চলতে পারে; আমার থাকবার দরকার নেই।

শৈলজা বিদ্রূপের সহিত কহিল, তোরই বা কি এমন জমিদারি লাটে উঠেছে যে, এখনই ছুটতে হবে?

মনোজ নীরস কণ্ঠে জবাব দিল, তা আপনার জেনে কি হবে? আমি কালই চ'লে যাব।

শৈলজা ব্যস্ত হইয়া কহিল, পাগল নাকি! জামাইবাবু লিখেছেন, তোমার কোথাও যাবার দরকার নেই। পরীক্ষার পর নাকি তোমার শরীর খুব খারাপ হয়েছে। এখানে থেকে শরীর সারলে তবে যাবে।

মনোজ উৎসুক কণ্ঠে কহিল, বাবা বুঝি চিঠি লিখেছেন? আমার চিঠির তো জবাব দেন নি!

তোকে আর পৃথক ক'রে চিঠি দেন নি, আমাকেই লিখেছেন। তা আমিও সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়েছি যে, খুব বেড়াবার ব্যবস্থা করেছি;

কোন চিন্তা নেই ; শরীর তো সারবেই, এমন কি মনের কোন অসুখ থাকলে তাও সেরে যেতে পারে।—বলিয়া মুচকি হাসিল।

মনোজ সন্দিগ্ধ স্বরে কহিল, বুঝতে পারলাম না মামা। কি শরীরে, কি মনে কোথাও আমার কিছুমাত্র অসুখ নেই। তবু আপনারা হঠাৎ এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন কেন, বলুন দেখি ?

শৈলজা দুই চোখ ডাগর করিয়া কহিল, বলিস কি ? ব্যস্ত হব না ? আত্মীয়স্বজনের কাজই তো তাই। লেখাপড়াই শিখেছিস, বুদ্ধি তো তোদের এখনও পাকে নি। মন যা চায়, তাইই করবার জন্যে তোদের ঝোঁক। তাতে ভাল হবে, না মন্দ হবে, তা বোঝবার ক্ষমতা তোদের হয় নি।

মনোজ আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, সে কি মামা ?

শৈলজা ঘাড় কাত করিয়া, চোখ উল্টাইয়া হাসিয়া কহিল, হ্যাঁ বাবা, তাই। তারপর ঘাড় সোজা করিয়া কহিল, মোটর চালাতে শিখেছিস ?

মনোজ হঠাৎ এই প্রশ্নে আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, কেন ? শিখেছি।

শৈলজা কহিল, শিখেছিস নাকি ? বেশ বেশ, তা হ'লে আমার কথাটা ধরতে পারবি ঠিক। আচ্ছা, যখন নতুন চালাতে শিখছিলি, তখন দেখেছিলি যে, মোটরটার পথের চেয়ে বিপথে চলবারই ঝোঁক বেশি ; নয় কি ? তা সেটা কি মোটরের দোষ ?—বলিয়া কিছুক্ষণ মনোজের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিল। মনোজ চুপ করিয়া রহিল। তারপর শৈলজা আবার বলিতে লাগিল, না, যে চালাচ্ছে তার ? ঠিকমত ষ্টিয়ারিঙের চাকা ঘোরাতে সে শেখে নি।

মনোজ কহিল, মামা, আপনি মোটর চালাতে জানেন ?

শৈলজা কহিল, না। শোন্, তেমনই তোদের বিয়ে হয়েছে, কিন্তু

তাকে ঠিকমত চালাতে এখনও শিখিস নি। তাই সে কাজ করতে হয় আমাদের—মানে মা, বাবা, মামা ও মামীদের।

সেদিনও বিকালবেলায় শৈলজা মনোজ ও মাধুরীকে লইয়া বেড়াইতে গেল। আজ আর নদীর ধারে নয়, দীঘির ধারে। উঁচু পাড়ওয়ালা প্রকাণ্ড দীঘি; কানায় কানায় কালো জল টলটল করিতেছে। মাঝখানটায় বিস্তর পদ্ম ও শালুক ফুটিয়াছে। এক পাড়ে শান-বাঁধানো ঘাট। গ্রামের কতকগুলি মেয়ে জল লইতে আসিয়াছিল। তাহারা ম্যানেজারবাবুকে দেখিয়া ঘোমটা টানিয়া জল লইয়া চলিয়া গেল। শৈলজা মাধুরীকে লইয়া একটা সিঁড়ির উপর বসিল। মনোজ একটু দূরে বসিবার উপক্রম করিতেই শৈলজা কহিল, অত দূরে কেন? কাছেই আয় না। এত লজ্জা কিসের?

মনোজ কহিল, লজ্জা কে করছে? এইখানেই বসি।—বলিয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িল।

শৈলজা কহিল, দীঘিটা এত বড় ছিল না। এমন বাঁধানো ঘাটও ছিল না। গ্রামের মেয়েদের নদী থেকে জল আনতে হ'ত। মৃত্যুঞ্জয়বাবু জমিদারি কিনেই অনেক টাকা খরচ ক'রে সকলের আগে এই কাজটি করেছিলেন। মেয়েদের ওপর এত দরদ আজকাল প্রায় দেখা যায় না। প্রাতঃস্মরণীয় লোক!—বলিয়া দীর্ঘশ্বাস-সহকারে বক্তব্য শেষ করিল। বাবার কথা মনে পড়িয়া মাধুরীরও দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল, চোখ দুইটি ছলছল করিতে লাগিল। মনোজ পুকুরের জলের দিকে তাকাইয়া রহিল, তাহার মানসিক অবস্থা বুঝা গেল না।

কিছুক্ষণ পরে মাধুরী শৈলজাকে কহিল, কত পদ্মফুল ফুটেছে দেখুন!

শৈলজা বাৎসল্য-রসার্দ্র কণ্ঠে কহিল, হ্যাঁ, মা, ফুটেছে বইকি। চাই তোমার পদ্মফুল?

মনোজ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া মনে মনে কহিল, ফুল চাই মানে? এখান থেকে হাত বাড়ালেই ফুল পাওয়া যাবে নাকি?

মাধুরী জবাব দিল না। শৈলজা কহিল, চাই তো বল মা, এখনই আনবার ব্যবস্থা করি।

মাধুরী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, চাই।

শৈলজা কহিল, বেশ। মনোজের উদ্দেশ্যে কহিল, যা বাবা, মায়ের জন্যে গোটা কয়েক ফুল এনে দে।

মনোজ বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, সে কি মামা, এই সন্ধ্যেবেলায় জলে নামব? কাল দুপুরে স্নান করবার আগে বলবেন, এনে দোব।

শৈলজা কহিল, না বাবা, কাল নয়, আজ এখনই এনে দে। মা লক্ষ্মীর ইচ্ছে হয়েছে যখন—

মনোজ রুষ্ট স্বরে কহিল, হোক, আমি পারব না।—বলিয়া ক্রুদ্ধ দৃষ্টি মাধুরীর উপর নিক্ষেপ করিল। মাধুরী তাহার দিকেই চাহিয়া মুচকি হাসিতেছিল, মনোজ চাহিতেই মুখ ফিরাইয়া লইয়া, কণ্ঠস্বরে অভিমানের আমেজ লাগাইয়া কহিল, থাক্ মামা, উনি রাগ করছেন।

শৈলজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া ক্ষোভের সহিত কহিল, রাগ করছে তো আমিই যাচ্ছি মা। সাঁতার তো জানি না, তা ছাড়া এই শরীর, তা হলেও একবার চেষ্টা ক'রে দেখি, যা থাকে কপালে।—বলিয়া থপথপ করিয়া একেবারে জলের ধারে গিয়া দাঁড়াইল।

মনোজ ডাকিয়া কহিল, থাক্, আপনার গিয়ে কাজ নেই, আমিই যাচ্ছি; কিন্তু কাল থেকে আমাকে বেড়াতে আসতে ডাকবেন না।—বলিয়া জামা জুতা খুলিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

একগুচ্ছ মৃণালসহ পদ্মফুল আনিয়া শৈলজার হাতে দিয়া মনোজ চাপা গলায় কহিল, দিনগে আপনার রাজকন্যাকে। তারপর ভিজা

কাপড় নিঙড়াইতে নিঙড়াইতে গজগজ করিতে লাগিল, যত সব আবদার!

শৈলজা একগাল হাসিয়া কহিল, বাবাজী, মেয়েদের আবদারের জন্যেই তো সংসার। নইলে বনে জঙ্গলে বাস করলেই হ'ত।

শৈলজার দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মনোজ কহিল, খুব ভাল হ'ত। এখন এই ভরসন্ধ্যেয় নেয়ে আমার সর্দ্দি হোক! বেশ লোকের কাছে শরীর সারতে পাঠিয়েছেন বাবা!

শৈলজা মনোজের কথায় কর্ণপাত না করিয়া মাধুরীর কাছে গিয়া কহিল, এই নাও মা, একটি পড়বার ঘরের টেবিলে ফুলদানিতে সাজিয়ে রেখো, বাবাজী ফুল ভারি ভালবাসে।

ফুলগুলি সযত্নে বুকের কাছে ধরিয়া কপোলে চিবুকে ও ওষ্ঠাধরে তাহাদের স্পর্শ-সুখ উপভোগ করিতে করিতে মাধুরী মনোজের জলসিক্ত স্বাস্থ্যময় সুগঠিত দেহের পানে আড়চোখে চাহিয়া রহিল।

মনোজ হাঁকিয়া কহিল, জুতো পরব কি ক'রে? জলে নষ্ট হয়ে যাবে যে!

শৈলজা কহিল, হাতে ক'রে নিয়ে চল্, আমি জামা চাদর নিয়ে যাচ্ছি।

মনোজ সরোষ নেত্রে একবার মাধুরীর দিকে তাকাইয়া কহিল, হাতে ক'রে নিয়ে চল্! কাল ও যুক্তি ছিল কোথায়?

মাধুরী নিরীহের মত সোজা তাকাইয়া রহিল, ও শৈলজা নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল।

রাত্রে সুরবালার কাছে রিপোর্ট হইল—মাধুরী মা যেমনই ফুল চাওয়া, বাবাজী অমনই কারও কথা না শুনে ঝপাং ক'রে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

সুরবালা এক গাল হাসিয়া কহিলেন, সত্যি! ও মা, আমার কি হবে!

পরের দিন সকালে মনোজ বিছানা হইতে উঠিতে পারিল না। নাক সড়সড় করিতেছে, মাথা দপদপ করিতেছে, হাত-পা টনটন করিতেছে, এবং সমস্ত শরীর ভারী হইয়া আছে। শৈলজা উঠাইতে আসিলে মনোজ ধরা গলায় কহিল, এখন উঠব না, জ্বর হয়েছে বোধ হয়।

শৈলজা তাহার গায়ে হাত দিয়া কহিল, পাগল! জ্বর কোথায় হয়েছে? একটুখানি সর্দ্দি, কাপ কয়েক চা খেলেই সেরে যাবে, ওঠ্।

মনোজ কহিল, আজ কিন্তু আমি পড়াতে যেতে পারব না, ব'লে দিচ্ছি।

শৈলজা কহিল, বেশ। আজ না হয় থাক্, আমি খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি।

সেদিনও সুধার চিঠি আসিল না। সুধা বোধ হয় অভিমান করিয়াছে, বুঝাইয়া-সুঝাইয়া আর একটি চিঠি দিতে হইবে। বেচারীর ভারি একা একা মনে হইতেছে বোধ হয়। শৈলজা-মামার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলে আর বাড়ি না ফিরিয়া সটান কলিকাতা যাইতে হইবে।

কিন্তু সেদিন মনোজের মনের মধ্যে সুধার চিন্তা বেশিক্ষণ আমল পাইল না। যে আবদারী মেয়ের জন্য তাহার দেহের এই দুরবস্থা হইয়াছে, তাহারই চিন্তা মনের মধ্যে বার বার আনাগোনা করিতে লাগিল।

পরের দিন সকালে পড়াইতে গিয়া মনোজ দেখিল, পড়িবার ঘরে টেবিলে ফুলদানিতে একটি শুষ্কপ্রায় পদ্মফুল।

সুরবালা আসিয়া কহিলেন, ছিঃ বাবা, অমন অবুঝ হতে আছে! মেয়ে আবদার করলে ব'লেই সন্ধ্যেবেলায় জলে নাবতে হবে! ওই রকম মেয়ে, ওর আবদার যে কে সারাজীবন ধ'রে রাখবে বাবা, তাই ভেবে আমার দিনে শান্তি নেই, রাত্রে ঘুম নেই। যাক, শরীরটা একটু ভাল তো বাবা?

মনোজ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, ভাল।

সুরবালা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে টানিয়া টানিয়া কহিতে লাগিলেন, কাল শুনে আর ভেবে বাঁচি না। ভাবলুম, যাই, একবার ছুটে গিয়ে দেখে আসি। তা সবাই বারণ করলে। মেয়েকেও খুব ধমকেছি। ও কি আবদার? ভালমানুষের ছেলে ব'লে তাই, না হ'লে—

এক মুহূর্ত্তে উদ্বেগাকুল কণ্ঠস্বরকে স্বাভাবিক পর্দ্দায় আনিয়া কহিলেন, মেয়েটাও কাল সারাদিন মুখটি চুন ক'রে বেড়িয়েছে।

মাধুরী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ভাল আছেন?

মনোজ গম্ভীরভাবে জবাব দিল, হ্যাঁ।—বলিয়া ফুলদানি হইতে ফুলটি লইয়া একটু নাড়িতেই ফুলের দলগুলি ঝরিয়া পড়িল।

মাধুরী কহিল, কাল বিকেল পর্য্যন্ত তাজা ছিল। আপনি তো কাল এলেন না! শেষের দিকে কণ্ঠস্বর একটু কাঁপিয়া উঠিল বোধ হয়। মনোজ একবার মাধুরীর মুখের দিকে তাকাইয়া মনে মনে কহিল, আবার আবদার হচ্ছে!—বলিয়া গম্ভীরভাবে বইটা টানিয়া লইয়া পড়াইতে আরম্ভ করিল।

দিন দুই পরে শৈলজা এক সময়ে মনোজকে কহিল, হ্যাঁ রে, বলছিলি, মোটর চালাতে জানিস। সত্যি নাকি?

মনোজ জবাব দিল, মিথ্যে ব'লে লাভ?

শৈলজা কহিল, মিথ্যে ব'লে লাভ অনেক, কিন্তু সে কথা নয়। চালাতে জানিস তো একদিন মোটরে ক'রে বেড়িয়ে আসা যাবে।

মোটর কোথায়?

আছে একটা। কর্ত্তা কোন্ এক সাহেবের কাছে কিনেছিলেন। যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন নাকি নিজেই চালাতেন। এখন গ্যারেজে বন্ধ আছে।

চলে ?

চলত ব'লেই তো শুনেছি। চল্ না, দেখা যাক।

মোটরটা চলিবে বলিয়াই মনে হইল। পরের দিন কাছের শহর হইতে তেল আনানো হইল, এবং বিকালবেলায় মনোজ মোটর আনিয়া জমিদার-বাড়ির সামনে হাজির করিল। শৈলজা বাড়ির মধ্যে চলিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে চারিদিকে ভিড় জমিয়া গেল। আবালবৃদ্ধবনিতা যে যেখানে যে অবস্থায় ছিল, ছুটিয়া আসিল এবং গাড়ি ও গাড়োয়ান দুইয়ের দিকেই বিস্ময় ও কৌতূহলের সহিত তাকাইয়া রহিল। ভিড়ের মধ্যে কোথাও কোথাও মনোজের 'অদ্ভুত কৃতিত্বের সম্বন্ধে জল্পনা চলিতে লাগিল। মনোজ শুনিতে পাইল, একটি ছেলে তাহার মাকে প্রশ্ন করিল, উ কে মা ? মা অবলীলাক্রমে উত্তর দিল, বাবুদের জামাই।

সেদিন সুরবালা সুদ্ধ সঙ্গী হইলেন। মা ও মেয়ে পিছনের সীটে বসিল, সামনে বসিল মাতুল ও ভাগিনেয়। একজন চাকরকে স্টার্ট দেওয়ার জন্য সঙ্গে লওয়া হইল।

ভিড় ঠেলিয়া ধীরে ধীরে গ্রাম পার হইয়া মনোজ গাড়ির গতি বৃদ্ধি করিল। যে রাস্তা দিয়া গ্রামে আসিয়াছিল, সেই রাস্তা দিয়া চলিল। যেখানে আসিয়া রাস্তাটি হইতে একটি শাখা স্টেশনের দিকে চলিয়া গিয়াছে, সেখানে গতি একটু কম করিতেই শৈলজা কহিল, সোজা চল্। আবার গাড়ি হুহু করিয়া চলিতে লাগিল। পিছন হইতে মাধুরী কহিল, ওই পাহাড়টার কাছে চলুন না মামা।

শৈলজা কহিল, ও কি আর এখানে মা! অনেক দূর।

একটি বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে গাড়ি থামাইয়া মনোজ কহিল, আর না, এই পর্য্যন্ত। এবার ফেরা যাক।

মাধুরী মাকে কহিল, না মা, এখনই না, একটু এখানে বেড়াইগে চল।

স্থরবালা কহিলেন, আমি আর যাব না মা, তোমরা যাও, আমি গাড়িতে বসি।

মাধুরী খালি পায়েই গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িল। শৈলজা ত্রস্তভাবে কহিল, খালি পায়ে না মা, চটিটা প'রে নাও।

মাধুরী আবদারের স্বরে কহিল, না মামা, থাক্, খালি পায়েই ভাল লাগবে।

মাঠের মধ্য দিয়া তিনজন বহুদূরে চলিয়া গেল। হঠাৎ পায়ের নীচে কাঁকর বিঁধিয়া মাধুরী 'উঃ' করিয়া উঠিতেই শৈলজা লাফাইয়া কাছে আসিয়া কহিল, কি হ'ল মা?

মাধুরী পায়ের তলা হইতে কাঁকরটি ছাড়াইয়া ফেলিয়া কহিল, কিছু না।

মনোজ বিদ্রূপের স্বরে কহিল, খালি পায়েই ভাল লাগছে বোধ হয়!

মাধুরী মনোজের উপর স্থতীক্ষ্ণ কটাক্ষ-শেল নিক্ষেপ করিল, কিন্তু মনোজের নির্বিকার গাম্ভীর্য্যের বর্ম্মে তাহা প্রতিহত হইল।

আরও কিছু দূর গিয়া মাধুরী আবার 'উঃ' করিয়া উঠিল। শৈলজা যথারীতি ব্যস্তসমস্তভাবে ছুটিয়া আসিল। এবার কাঁকর নয়, কাঁটা। শৈলজা নিজের গায়ের চাদর পাতিয়া মাধুরীকে বসাইল। তারপর মনোজকে কহিল, আমি তো উবু হয়ে বসতে পারব না, তুইই দেখ্, যদি কাঁটাটা বের করতে পারিস।

মনোজ উবু হইয়া বসিয়া পায়ে হাত দিতেই মাধুরী মুচকি হাসিল। মনোজ তাহা দেখিতে পাইয়া বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, হাসছ যে?

মাধুরী হাসি চাপিয়া কহিল, পায়ে স্থড়স্থড়ি লাগছে যে।

শৈলজা একটু দূরে গিয়া মনোযোগসহকারে আকাশ পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল।

মনোজ জিজ্ঞাসা করিল, সেফ্‌টিপিন আছে, কিংবা মাথার কাঁটা? মাধুরী শাড়ি হইতে একটি সোনার সেফ্‌টিপিন খুলিয়া দিল।

মনোজ কাঁটা তুলিতে তুলিতে কহিল, আমাদের গরিবদের বাড়ির মেয়েরা সোনা পায়ে ঠেকায় না, তোমাদের বড়লোকদের মেয়েদের বুঝি সে নিয়ম নেই, না?

মাধুরী মুখটি ম্লান করিয়া কহিল, কি করব, আর অন্য কাঁটা নেই যে সঙ্গে।

কাঁটা তোলা হইলে মাধুরী কহিল, দাঁড়ান।

মনোজ কহিল, কেন?

বারে! প্রণাম করব না, পায়ে হাত দিলেন?—বলিয়া মাধুরী মনোজকে প্রণাম করিল।

ফিরিয়া আসিয়া শৈলজা কহিল, মাধুরী মার আবার পায়ে কাঁটা ফুটল। তা বাবাজী আমার সব দিকে ওস্তাদ, টুক ক'রে কাঁটা বের ক'রে দিলে। মাধুরীর দিকে তাকাইয়া কহিল, একটুও লাগে নি, না মা? মাধুরী লজ্জায় মুখ রাঙা করিয়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না।

সেদিন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত মনোজ ঘুমাইতে পারিল না। একটি অলক্তকরঞ্জিত শঙ্খধবল চরণের কোমল স্পর্শ তাহার সর্ব্বদেহে মধুবর্ষণ করিতে লাগিল, এবং চরণের মালিক মনের মধ্যে আসর জমকাইয়া বসিয়া রহিল, বেচারী সুধাকে আমলই দিল না।

দিন দুই পরে সুরবালা, শৈলজা ও মনোজকে মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। আহারের সময়ে মাধুরী নিজে পরিবেশন করিল এবং সুরবালা কাছে বসিয়া তদারক করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ জানাইতে

লাগিলেন যে, সমস্ত খাদ্যদ্রব্য মাধুরী নিজ হাতে প্রস্তুত করিয়াছে, কাহাকেও রান্নাঘরের পাশ মাড়াইতে দেয় নাই।

আহারের পরও সুরবালা মনোজকে ছাড়িয়া দিলেন না, বলিলেন, একটু বিশ্রাম ক'রে যাও বাবা। তোমার তো এখন কোন কাজ নেই।

বুড়ী ঝি সঙ্গে করিয়া মনোজকে বিশ্রাম-কক্ষে পৌঁছাইয়া দিল। কক্ষটি বৃহৎ। মেঝে দামী কার্পেট দিয়া ঢাকা। কক্ষের এক পাশে একটি ঝকঝকে পালিশ করা প্রকাণ্ড পালঙ্কে আনকোরা নূতন নেটের মশারি ও ধবধবে বিছানা। অন্যান্য সাজসজ্জা ও আসবাবপত্র সবই গৃহকর্ত্রীর অর্থ-প্রাচুর্য্যের পরিচয় দিতেছে। বুড়ী ঝি একগাল হাসিয়া কহিল, মা দিদিমণির বরের জন্যে নিজের হাতে ঘর সাজিয়েছেন। মনোজ গম্ভীর হইয়া রহিল।

বিছানায় শুইয়া মনোজ ভাবিতে লাগিল, সুরবালা কি তাহাকেই মাধুরীর বর ঠিক করিয়াছেন নাকি? তা হইলে তো সর্ব্বনাশ! সে যে সুধাকে কথা দিয়া আসিয়াছে, এবং সুধা তাহার পথ চাহিয়া বসিয়া আছে। সুধার সহিত যেরূপ ঘনিষ্ঠভাবে সে মিশিয়াছে, তাহার পর সুধাকে ত্যাগ করা তাহার পক্ষে অত্যন্ত অধর্ম্মের কাজ হইবে। এমনই করিয়া সুধার চিন্তা ন্যায়-অন্যায়, ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, উচিত-অনুচিতের সরকারী বাঁধা রাস্তা দিয়া চলিতে লাগিল। একবারও তাহার মনে হইল না, সুধা তাহার জীবনে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়াইয়া গিয়াছে, তাহাকে না পাইলে জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিবে। অধিকন্তু এই সুশুভ্র ও সুপরিসর শয্যায় মাধুরীর লজ্জাজড়িত দেহটিকে নিজ দেহের একান্ত সন্নিকটে কল্পনা করিতে তাহার ভালই লাগিল।

কি করছেন?—মেয়েলী কণ্ঠের এই প্রশ্ন শুনিয়া মনোজ চমকিয়া চাহিয়া দেখিল, একটি বছর সতেরো বয়সের শ্যামবর্ণ মেয়ে পাশে দাঁড়াইয়া

মৃদু হাস্য করিতেছে। মেয়েটির চেহারা চলনসই। সীমন্তে সিন্দূর ও গায়ে গহনার বাহুল্য দেখিয়া বুঝা যাইতেছে, সে কোন সম্পন্ন গৃহস্থের বধূ।

মনোজ শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিল। মেয়েটি সপ্রতিভভাবে শয্যার এক প্রান্তে বসিয়া কহিল, ঘুমুচ্ছেন নাকি? মনোজ দেওয়ালের দিকে একটু সরিয়া বসিয়া কহিল, না। কিন্তু আপনাকে চিনতে পারলাম না।

মেয়েটি মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, কখনও না দেখলে চিনবেন কি ক'রে? আমি মাধুরীর সই। মনোজ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, মাধুরী কোথায়?

মেয়েটি কহিল, না দেখে থাকতে পারছেন না বুঝি?,

মনোজ তাড়াতাড়ি জবাব দিল, না না, তা নয়, এমনিই জিজ্ঞাসা করছি।

মেয়েটি ঘাড় নাড়িয়া কহিল, বুঝেছি, আর ঢাকবার দরকার নেই। ডেকে আনছি সইকে।—বলিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল এবং অনতিবিলম্বে মাধুরীকে লইয়া হাজির হইয়া কহিল, ডাকতেও যেতে হয় নি। সই আমার এইখানেই ঘুরঘুর করছিল। অবস্থা দুজনেরই সমান।

মাধুরী কৃত্রিম কোপের সহিত মেয়েটিকে কহিল, কি যা-তা বলছিস? ফাজিল!

মেয়েটি হাসিয়া কহিল, ফাজিল বইকি! যা বলবার জন্যে ছটফট করছিস্, তাই শুনিয়ে দিচ্ছি। এর পর আশীর্ব্বাদ করবি আমাকে।

মেয়েটি মনোজকে কহিল, তাস খেলতে জানেন? আসুন না, খেলা যাক।—বলিয়া আঁচল হইতে একজোড়া তাস বাহির করিল।

'চোর-গোলাম' খেলা চলিতে লাগিল। নিজের খেলার দোষেই হউক, মাধুরী ও তাহার সখীর চৌর্য্য ও চাতুর্য্যের জন্যই হউক, মনোজ প্রতি বারই চোর হইতে লাগিল।

সই হাসিয়া কহিল, আপনি তো ভারি চোর! মাধুরীর দিকে তাকাইয়া কহিল, মন চুরি গেছে বলছিলি যে! ওঁরই কাজ।

মাধুরী সকোপে কহিল, দূর ছুঁড়ী! যা মুখে আসে তাই বলে!

কিন্তু তাহার মুখ ও চোখ তাহাকে হাতে-হাতে ধরাইয়া দিল। সে য তাহার প্রিয় সখীর কাছে গোপনে তাহার হৃদয়-দৌর্ব্বল্যের কথা প্রকাশ করিয়াছে, সে সম্বন্ধে মনোজের বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। এবং তাহার মন সেই 'গোপন কথা'টির চারিপাশে পুষ্পের কাছে মৌমাছির মত গুঞ্জন করিতে লাগিল।

পরদিন ঘনশ্যামবাবুর চিঠি আসিল, মনোজের নামে। লিখিয়াছেন, কলিকাতা হইতে খবর আসিয়াছে যে, মনোজ তৃতীয় শ্রেণীতে পাস করিয়াছে। নিয়মিত পড়াশুনা করা সত্ত্বেও পরীক্ষার ফল যে কেন এত খারাপ হইল, তিনি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, তাহার জন্য মনোজের মন খারাপ করিবার দরকার নাই। কারণ ওকালতি করিতে হইলে এম. এ. পরীক্ষার ফলাফলে কিছু আসিয়া যাইবে না। আইন পরীক্ষায় ভাল ফল করিতে পারিলেই হইল। মনোজের এখন বাড়ি ফিরিবার অথবা কলিকাতা যাইবার প্রয়োজন নাই। কারণ শীঘ্রই বিশেষ প্রয়োজনবশত তাঁহাকে এখানে আসিতে হইবে। তখন সাক্ষাতে সব বিষয়ে পরামর্শ হইবে। পুনশ্চ লিখিয়াছেন, কলিকাতা হইতে কে এক রাঘবচন্দ্র বোস মনোজকে চিঠি দিয়াছেন। চিঠিটি পাঠাইয়া দেওয়া হইতেছে।

সেই চিঠিটি খুলিয়া মনোজ পড়িল, রাঘববাবুর জবানিতে সুধা লিখিতেছে, অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহে সুধার বিবাহ স্থির হইয়াছে, বিবাহ-সভায় মনোজের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

চিঠি দুইটি হাতে করিয়া মনোজ বিহ্বলের মত বসিয়া রহিল। তাহার

চক্ষের সম্মুখে কত যত্নে আঁকা ভবিষ্যতের ছবি লেপিয়া মুছিয়া একাকার হইয়া গেল। কত আশা করিয়াছিল, ভাল করিয়া এম এ. পাস করিয়া কলিকাতায় প্রফেসারি করিবে ও সুধাকে বিবাহ করিয়া সংসার পাতিবে। তৃতীয় শ্রেণীতে পাস করিয়া প্রফেসারি পাওয়ার আশা বাতুলতা। আর সুধা তো দুই দিন পরে পরের স্ত্রী হইবে। ভবিষ্যতে কোন দিন দেখা হইলে সে চিনিবে না, চেনা চলিবে না। কিন্তু সুধা তাহাকে এত সহজে ভুলিল? এত সহজে অন্যের সঙ্গে বিবাহে মত দিতে পারিল? আসিবার দিন সুধা যে ভাবে তাহার বুকে মুখ রাখিয়া কাঁদিয়াছিল, ফিরিয়া যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ মিনতি করিয়াছিল, তাহা কি শুধু ছলনা? তাহার পিছনে ভালবাসা ছিল না? হয়তো ছিল। কিন্তু সুধা বুদ্ধিমতী, সে জানে, ভালবাসাই জীবনের সব নহে। বাস্তব জীবনে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির তালিকায়, নিমন্ত্রণ-বাড়ির ভোজ্য-তালিকায় পান-সিগারেটের মত, ভালবাসার কোন স্থান নাই। পাইলে ভাল, না পাইলে বিশেষ ক্ষতি নাই। তাহার মত অপদার্থকে বিবাহ করিয়া কেবল ভালবাসা পাওয়ার চেয়ে হয়তো ভূষণকে বিবাহ করিয়া ভাল কাপড়, ভাল গহনা পাওয়াই সুধা ভাল মনে করিয়াছে। কিন্তু সে নিজে কি এ অবস্থায় অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করিয়া সুধাকে বিবাহ করিতে পারিত? সুধা তাহাকে এত সহজে নিষ্কৃতি না দিলে তাহাকেই হয়তো নিঃশব্দে বিদায় লইতে হইত; এবং তাহাতে সুধার বুক হয়তো ফাটিয়া যাইত, কিন্তু তাহার বুক ফাটিতে চাহিত না, ফাটিলেও মাধুরী রূপ ও রৌপ্যের ঝাল দিয়া তাহা বেমালুম জুড়িয়া দিত। অতএব সুধা তাহাকে ত্যাগ করিয়া তো ভালই করিয়াছে। কিন্তু এত সহজে? মাধুরীকে বিবাহ করিলেও সে কি সুধাকে কোন দিন ভুলিতে পারিবে? জীবনে প্রথম নারীসঙ্গের সুতীব্র অনুভূতি, দুঃসহ আনন্দ যে সুধার কাছে

পাইয়াছে, সে যে তাহার সমস্ত চেতনার সঙ্গে জড়াইয়া গিয়াছে। বাহিরের সংসারে হয়তো সুধার সহিত তাহার কোন সম্পর্ক থাকিবে না, কিন্তু অন্তরাকাশের এক প্রান্তে সুধার স্মৃতি একটি বৃহৎ ও উজ্জ্বল তারকার মত বোধ হয় আমরণ জ্বলিতে থাকিবে।

শৈলজা আসিয়া কহিল, কি চিঠি এল রে? পাস করেছিস?

মনোজ বিষণ্ণ মুখে কহিল, হ্যাঁ, ভাল হয় নি।

শৈলজা চোখ মিটকাইয়া, ঘাড় নাড়িয়া কহিল, যাকগে, ওতেই হবে। গিন্নীকে খবর পাঠিয়ে দিইগে।

বিকালে শৈলজা মনোজকে সুরবালার সমীপে প্রায় টানিয়া লইয়া গেল।

সুরবালা অশ্রুবিগলিত নয়নে গদ্গদ কণ্ঠে কহিলেন, ভারি আনন্দ হয়েছে বাবা। এ সময়ে তিনি যদি বেঁচে থাকতেন!

শৈলজা কহিল, ওঃ, ভারি সুখী হতেন। বিদ্যেসাগরকে কেতাবেই দেখতে পাওয়া যায়, এ রকম জল-জীয়ন্ত বিদ্যেসাগর দেখতে পাওয়া সোজা কথা নাকি! কি রকম ফল করেছে! সারা দেশের যত ছেলে পরীক্ষে দিয়েছিল, সকলের ওপরে এর নাম, বড় বড় অক্ষরে লেখা।

মনোজ লজ্জিত মুখে মাথা নীচু করিল।

সুরবালা বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে কহিলেন, সত্যি! তা হ'লে তো এর পর বাবাজী হাকিম হবে!

শৈলজা জবাব দিল, শুধু হাকিম? হাইকোর্টের জজ হবে' ও, আপনি দেখে নেবেন।

সুরবালা কহিলেন, এত আনন্দ হচ্ছে আমার। মনে হচ্ছে, আমার নিজের ছেলে পাস করেছে। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া মনোজকে কহিলেন, হ্যাঁ বাবা, আমার ছেলে হতে তোমার আপত্তি আছে?

মনোজ লজ্জায় অধোবদন হইল।

সুরবালা কহিলেন, আমার মাধুরী হয়তো তোমার যোগ্য নয়, তবু যদি তাকে দয়া ক'রে পায়ে—

শৈলজা বাধা দিয়া কহিল, ও কি কথা বলছেন দিদি? মাধুরী মাকে ও মাথায় ক'রে নেবে।

সুরবালা মনোজের দিকে তাকাইয়া সাগ্রহে কহিলেন, হ্যাঁ বাবা, সত্যি?

মনোজ নীরবে নতমুখে বসিয়া রহিল।

৪

মনোজ যাইবার পর সুধার বড় একা একা মনে হইতে লাগিল: যে সংসারের সহিত যুক্ত থাকিয়া সে এতদিন বাড়িয়া উঠিয়াছে, ব্যাঙাচির লেজের মত কখন সেই সংসার তাহার জীবন হইতে খসিয়া পড়িয়াছে, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। এখন সেই সংসারের সহিত পুনরায় যুক্ত হইবার তাহার ইচ্ছা নাই এবং ইচ্ছা থাকিলেও উপায় নাই। তাই সংসারের প্রাত্যহিক কাজগুলিতে পূর্ব্বের মত তাহার মন আশ্রয় পাইল না, আনন্দও পাইল না। যে রাজকর্ম্মচারীর স্থানান্তরিত হইবার আদেশ আসিয়াছে, নবাগত ব্যক্তিকে চার্জ বুঝাইয়া দেওয়া পর্য্যন্ত সে যেমন যন্ত্রের মত নির্ব্বিকার ও নির্লিপ্ত ভাবে কাজ করিয়া যায়, অথচ তাহার মন আগামী কর্ম্মস্থানের দিকে নিবদ্ধ থাকে, সুধাও তেমনই তাহার প্রাক্তন জীবনযাত্রার মধ্যে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ত্রুটিহীনভাবে তাহার কাজ করিতে লাগিল বটে, কিন্তু তাহার অন্তরাত্মা ভাবী জীবনের দিকে নির্নিমেষে তাকাইয়া রহিল

মনোজের সহিত পরিচিত হইবার পূর্ব্বে সুধার জীবন সরল ছিল, সহজ ছিল। বাবার সেবা করিত, পড়াশুনা করিত, সংসারের কাজ-কর্ম্ম করিত, বিশুর সহিত খুনসুড়ি করিত, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গল্প-গুজব করিত ও খেলা করিত, এবং রাত্রি নয়টা বাজিতে না বাজিতে ঘুমে অসাড় হইয়া পড়িত। আর এখন জীবনে জটিলতা আসিয়াছে; যেখানে মাত্র বীচিবিভঙ্গ হইত, সেখানে ঘূর্ণির সৃষ্টি হইয়াছে। দিনের বেলায় পড়াশুনা করিতে ভাল লাগে না, বসিয়া বসিয়া দিবাস্বপ্ন দেখে। রাত্রে ঘুম আসিতে চাহে না, কড়িকাঠের দিকে তাকাইয়া চিন্তার জাল বুনিতে বুনিতে রাত্রি শেষ হইয়া যায়।

সুধার মানসিক বিপর্য্যয় রাঘববাবু বুঝিতে পারেন না। বুঝিতে পারিবেনই বা কি করিয়া? সারা দিন রাত বিছানায় পড়িয়া ঝিমাইতে থাকেন। দিন দিন তাঁহার দেহের অবস্থা খারাপ হইয়া আসিতেছে। আজকাল নিজে উঠিতে বসিতে পর্য্যন্ত পারেন না। সুধাই বিছানা হইতে উঠায়, মুখ ধোয়াইয়া দেয়, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে, খাওয়ায়, স্নান করায়, মালিশ করে ও সেক দেয়। তাহার কোন কাজে কিছুমাত্র ত্রুটি থাকে না। তবে হয়তো কাজ করিতে করিতে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হইয়া যায়, এক কথার জবাব অন্যভাবে দিয়া বসে। কিন্তু ইহার যে কোন গুরুতর কারণ আছে, তাহা রাঘববাবু ভাবিতে পারেন না। ভাবিতে পারেন না যে, যে সুধা সাত বৎসর বয়স হইতে সতেরো বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শুদ্ধ তাঁহারই হৃদয়ের রসে বাড়িয়া উঠিয়াছে, সে আজ হঠাৎ তাঁহাকে নিষ্প্রয়োজন বলিয়া ত্যাগ করিয়া জীবনী-রস আহরণ করিবার জন্য হৃদয়ান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। মনোজকে তিনি স্নেহের চক্ষে দেখিয়াছেন, কয়েক দিন দেখেন নাই বলিয়া খুঁতখুঁত করিয়াছেন, হয়তো মনে মনে কোন দিন তাহাকে তাঁহার কন্যার স্বামী

বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু সে যে তাঁহার কন্যার জীবনে এত গভীরভাবে শিকড় চালাইয়াছে যে, তাহাকে টানিয়াও ছাড়ানো যাইবে না, যাইলেও কন্যার জীবন ভাঙিয়া খানখান হইয়া যাইবে, তাহা তিনি বুঝিবেন কি করিয়া ?

আজকাল ভূষণ প্রতিদিন সন্ধ্যার পর হাজির হয় এবং রাঘববাবুর সঙ্গে আলাপ ও আলোচনা করিতে করিতে ঘন ঘন দরজার দিকে তাকাইতে থাকে। সুধা মাঝে মাঝে আসিয়া হাজির হয়, কখনও তামাক সাজিয়া দিয়া যায়, কখনও আসিয়া বাবার পিঠের বালিশটা ঠিক করিয়া দিয়া যায়, আবার কোন দিন নিঃশব্দে বসিয়া রাঘববাবুর পায়ে মালিশ করিতে করিতে তাহাদের আলোচনা শোনে। সেদিন ভূষণের উৎসাহের সীমা থাকে না ; সেদিন শুধু মুখ দিয়া নহে, সর্ব্বাঙ্গ দিয়া সে কথা বলিতে থাকে। হাত নাড়িয়া, চোখ বড় করিয়া, নাক ফাঁপাইয়া, ভ্রূ কুঁচকাইয়া, ভুঁড়ি দোলাইয়া, কথা যেন আর শেষ হইতে চাহে না— নিজের বিষয়-বৈভবের কথা, বংশগৌরবের কথা। কামারপুরের সমস্ত জমিদারিটাই এখন তাহার। অন্যান্য শরিকানী স্বত্ব সব সে নিজে কিনিয়া লইয়াছে। জমিদারির মধ্যে কতকগুলা কয়লাখাদ বাহির হইয়াছে, সাহেব কোম্পানিকে মোটা সেলামি ও রয়ালটিতে সেগুলা সে ইজারা দিয়াছে। এখানে সে এমন নিরীহটির মত বসিয়া গল্প করিতেছে বটে, কিন্তু জমিদারিতে তাহার প্রতাপে ব্যাঘ্র ও বলদ, খাদক ও খাদ্য হইয়াও নাকে নাক ঠেকাইয়া এক ঘাটে জল পান করে। এখানে ভাড়াটে বাড়িতে বাস করিলে কি হইবে, দেশে তাহার চক-মিলানো বাড়ি দেখিলে চার দণ্ড চাহিয়া থাকিতে হইবে। শুধু কি দেশেই বাড়ি, কোথায় বাড়ি নাই তাহার ? দেওঘর, গিরিডি, ঝাঁঝা, মধুপুর, শিমুলতলা—সব জায়গাতেই এক-একখানা বাড়ি। আর যেমন তেমন

বাড়ি নয়, ভাল ভাল বাড়ি, মাসে মাসে মোটা বাড়ি-ভাড়া পায়। পুরীতেও একখানা বাড়ি করিবে সে, টাকা মজুত, মনটা একটু মজবুত হইয়া উঠিলেই হয়। রাঘববাবু কোন দিন ঝাঁঝা গিয়াছেন? বেতো রোগীদের সুইজারল্যাণ্ড। দুই দিন সেখানের জল খাইলেই আর হাওয়া টানিলেই বাতে পঙ্গু রোগীও দৌড়-ঝাঁপ করিতে শুরু করে।

রাঘববাবু বিস্ময়াহত কণ্ঠে বলেন, সত্যি নাকি?

সুধাও কৌতূহলাক্রান্ত নয়নে চাহিয়া থাকে, বাবাকে বলে, চল না বাবা।

রাঘববাবু সঙ্কোচে হাসিয়া বলেন, কোথায় পাব মা, এত টাকা?

ভূষণ বলে, যাবেন আপনি? টাকার জন্যে ভাববেন না। আমার নিজের বাড়ি, একটি পয়সা ভাড়া লাগবে না। তা ছাড়া খরচপত্র? ওঃ, সে ব্যবস্থা হবে এখন।

ভূষণ সুধার দিকে কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া স্পষ্ট জানাইয়া দেয়, রাঘববাবুকে তাহার পরমাত্মীয় বলিয়া মনে হয়, রাঘববাবুও যেন তাহাকে পর মনে না করেন। তাহা ছাড়া ঝাঁঝা যখন এত কাছে, এবং রাঘববাবুর যখন এত বাত, তখন মনে করাও উচিত নয়।

রাঘববাবু অপ্রতিভভাবে বলেন, আপনাকে—

ভূষণ বাধা দিয়া সবিক্রমে বলিয়া উঠে, আমাকে 'আপনাকে' নয়, 'তোমাকে', বয়সে আমি আপনার চেয়ে অনেক ছোট যে।

রাঘববাবু অপরাধীর মত বলেন, তা বটে, তা বটে। তোমাকে— তোমাকেও আমার আপনার লোক ব'লেই মনে হয়। তবে সেজন্যে নয়, মানে, এই শরীরে কেই বা সব ব্যবস্থা করবে, কেই বা সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবে?

ভূষণের উৎসাহ উদ্দাম হইয়া উঠে, কোমর হইতে মাথা পর্য্যন্ত

সবটাই প্রবলভাবে আন্দোলিত করিয়া কহে, আমি, আমি সব ব্যবস্থা করব, নিয়ে যাব, কিছু ভয় করতে হবে না আপনাকে। কবে যাবেন বলুন ?—বলিয়া এমনই ভাব দেখায়, যেন বলিবামাত্র রাঘববাবুকে কাঁধে তুলিয়া এখনই হাওড়া স্টেশনে হাজির করিয়া দিবে।

রাঘববাবু চিন্তিত মুখে বলেন, আমি একটু ভেবে বলব এখন।

ভূষণ যেন মুষড়াইয়া যায়, সহজ গলায় বলে, ও, ভাববেন! তা ভাবুন, মোট কথা, তাড়াতাড়ি জানাবেন। পূজোর মরসুম কিনা, ভাড়াটেদের ভারি ভিড়।

সুধা রাঘবকে বলে, বাবা, তোমার পেন্‌শনটা—

কয়েক মাস মনোজই পেন্‌শন আনিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল।

ভূষণ শুনিতে পাইয়া বজ্রগম্ভীর স্বরে বলে, কি ?

রাঘববাবু কাঁচুমাচু হইয়া বলেন, কিছু না, পেন্‌শনটা আনবার ব্যবস্থা করতে হবে, কি ক'রে যে যাই, এই শরীর—

ভূষণ সক্ষোভে কহে, ও, এই আমাকে আপনার মনে করেন! আমি রয়েছি কি জন্যে ? আমি ব্যবস্থা করব।

রাঘববাবু কৃতজ্ঞতার হাসি হাসিয়া কহেন, ভারি উপকার করা হবে তা হ'লে, আমার যে শরীর—

ভূষণ বাধা দিয়া বলে, আপনাকে ও কথা বলতে হবে কেন ? সব দেখতে পাচ্ছি যে! কানা তো নই, কি বলেন ?—বলিয়া সুধার দিকে তাকাইতেই সুধা ঘাড় নাড়িয়া জানায়, না।

ভূষণ কহে, তবে ? কিছু ভাবনা নেই আপনাদের। আমি যখন আছি আর আপনাদের সঙ্গে যখন আলাপ হয়েছে, তখন সব ব্যবস্থা করব আমি।—বলিয়া ডান হাতটা বুকে ঠুকিয়া যুগপৎ কন্যা ও পিতার দিকে তাকাইতে থাকে।

পূজা আসিয়া পড়িল। রাঘববাবুর প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও ভূষণ তাঁহাদের সমস্ত পূজার খরচ বহন করিল। কহিল, আপনার নিজের ছেলে থাকলে কি করত? আমাকেও তাইই মনে করুন না।

সুধা বাবার কাছে খুঁতখুঁত করিতে লাগিল, কহিল, ভূষণবাবুর ভারি অন্যায়! আমার জন্যে এত ভাল শাড়ি কেনবার কি দরকার? আমি এ পরতে পারব না বাবা।

রাঘববাবু সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, ছিঃ মা, তা ক'রো না। স্নেহ ক'রে দিয়েছে, তার অপমান ক'রো না। তোমাকে নিজের বোনের মত মনে করে হয়তো।

সকলের চেয়ে স্ফূর্ত্তি হইল বিশুর। পুরা মাপের ফরাসডাঙার ধুতি, গরদের পাঞ্জাবি, চটিজুতা, জীবনে পরিয়াছে কিনা সন্দেহ। তাই দিবারাত্র অঙ্গ হইতে তাহাদের নামাইতে চাহিল না এবং সারাদিন চটি-জুতার শব্দে ও ভূষণের প্রশংসায় বাড়িসুদ্ধ সকলকে অস্থির করিয়া তুলিল।

একদিন মনোজের একটি চিঠি আসিল। চিঠির সার মর্ম্ম এই—সুধার জন্য মনোজের অত্যন্ত মন কেমন করিতেছে। কিছুই ভাল লাগিতেছে না। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গ পর্য্যন্ত বিস্বাদ হইয়া গিয়াছে। সুধা বোধ হয় বেশ মনের আনন্দে দিন কাটাইতেছে। মেয়েদের মন জলের মত, যে কোন পাত্রে অবলীলাক্রমে আশ্রয় লইতে পারে, পুরাতন পাত্রের কথা একবারও মনে পড়ে না। পুরুষের তথা মনোজের মন লোহার মত, যে ছাঁচের ছাপ একবার পড়ে, তাহা সহজে মুছিতে চায় না। সুধাকে ছাড়া মনোজের চলিবে না, এ কথা সুধা যেন সর্ব্বদা মনে রাখে। সন্ধ্যার পর সুধা কি আজকাল ছাদে যায়? মনোজও সন্ধ্যার পর ছাদে গিয়া সুধাদের বাড়ির দিকে তাকাইয়া থাকে (অবশ্য আন্দাজে); বাতাসে সুধার চুলের গন্ধ ও তারায় সুধার চক্ষের দীপ্তি আবিষ্কার করিবার চেষ্টা

করে। সুধা হয়তো জলের ট্যাঙ্কটার পাশে গালে হাত দিয়া বসিয়া কণ্বতনয়া শকুন্তলার মত চিন্তায় বিভোর হইয়া থাকে। কিন্তু কাহার চিন্তায়? মনোজের, না অন্য কাহারও? ভূষণবাবু কি আজকাল প্রতি-দিন সন্ধ্যায় আসে? তাহার সহিত সুধা যেন বেশি অন্তরঙ্গতা না করে। দোহাই! সুধা যেন আর দিন কয়েক কষ্ট করিয়া মনোজকে মনে রাখে। মনোজ শীঘ্রই সুধার উপর ক্রোকী পরোয়ানা লইয়া হাজির হইবে।

মনোজের চিঠি পড়িয়া সুধা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, ঠিক, ঠিক। আমার ওই রকমই হইয়াছে। প্রেমরোগের বোধ হয় ওই লক্ষণ—দিবারাত্র চিন্তা, মন খারাপ, বন্ধু-বান্ধব বিষবৎ। বাবার ডাক্তারী শাস্ত্র খুলিলে বোধ হয় ইহার ঔষধ মিলিতে পারে। কিন্তু সে ঔষধ সুধা কিছুতেই খাইবে না। কারণ এ রোগের যন্ত্রণা থাকিলেও রোগ সারাইতে ইচ্ছা করে না। সুধার মনে পড়ে, যখন নূতন কান ফুটাইয়া ফুল পরিয়াছিল, কানে খুব লাগিত। তবু তো সুধা ফুল দোলাইতে ছাড়ে নাই। মনোজ বাতাসে তাহার চুলের গন্ধ পায়। তাহার চুলের গন্ধ বুঝি এতদূর যাইতে পারে! পাগল! নিশ্চয় পাশের বাড়ির কোন মেয়ে সর্ব্বাঙ্গে এসেন্স ঢালিয়া মনোজের মন ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছে। মনোজকে সাবধান করিয়া দিতে হইবে। মনোজের সন্দেহ দেখিয়া সুধার হাসি পায়, ভালও লাগে। তাহার জন্য একজন দিবারাত্র চিন্তা করিতেছে, তাহাকে না দেখিয়া একজনের জীবন বিস্বাদ হইয়া উঠিতেছে, পাছে তাহাকে হারাইতে হয়, এই ভয়ে একজনের উৎকণ্ঠার অন্ত নাই—ভারি ভাল লাগে ইহা ভাবিতে। প্রেমের দেবতা অদ্ভুতকর্ম্মা ব্যক্তি, হঠাৎ একজনের মূল্য আর একজনের কাছে কত অসম্ভবরূপে বাড়াইয়া দেয়।

অনেকদিন পরে সুধা সেদিন বিকালবেলায় ছাদে উঠিল। দেখিল,

ভূষণবাবুর তেতলার ঘর আবার খোলা হইয়াছে। বউটির মৃত্যুর পর অনেকদিন বন্ধ ছিল। একজন বৃদ্ধা সেই ঘরে ঘোরাঘুরি করিতেছে। সুধা শুনিয়াছে, ভূষণবাবুর মা, কাশীতে পুণ্যসঞ্চয় দিন কয়েকের জন্য স্থগিত রাখিয়া, বিপত্নীক পুত্রকে সান্ত্বনা দিতে আসিয়াছেন। বৃদ্ধার বয়স হইলেও শরীর বেশ শক্ত ও পোক্ত, লম্বা দোহারা গঠন, মাথার চুল পুরুষের মত ছোট করিয়া ছাঁটা, কোমর হইতে দেহের উপরের ভাগটা সামনের দিকে একটু ঝুঁকিয়া আছে, একটুখানি খোঁড়াইতেছেন। তাহাকে দেখিয়া বৃদ্ধা, ঢেঁকিতে পা দিবার ভঙ্গীতে, আলিসার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিলেন, তুমিই রাঘববাবুর মেয়ে?—ভূষণ তোমাদের নাম করে।

সুধা নমস্কার করিয়া কহিল, আপনি বুঝি ভূষণবাবুর মা? কবে এলেন?

এসেছি দিন কয়েক, বিপদের খবর পেয়ে আসতে হ'ল, ছেলে অনেক ক'রে চিঠি লিখেছিল। না হ'লে বাবা বিশ্বেশ্বরের ছিচরণ ছেড়ে কোথাও নড়তে ইচ্ছে করে না।—বলিয়া বিশ্বেশ্বরের উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। তারপর দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া কহিলেন, ছেলেটার অদেষ্ট! এই বয়েসে দু-দুটো সোনার চাঁদের মত বউ গেল। তাও বলি, হতভাগীদেরও পোড়া কপাল! এমন সোয়ামী, এমন সোনার সংসার দুদিন ভোগ করতে পেলে না!

সুধা বলিয়া ফেলিল, দেখে শুনে আর একটি বউ আনুন।

বৃদ্ধা মৃদু হাস্য করিয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে কহিলেন, তার জন্যেই তো এসেছি মা। ভূষণের কিই বা বয়েস। ষেটের কোলে চল্লিশে পা দিয়েছে কি দেয় নি, তা ছাড়া ছেলে তো হয় নি, সবগুনোই মেয়ে, রাজত্যি কে ভোগ করবে মা? তবে মা, রূপসী মেয়েতে আমার ঘেন্না ধ'রে গেছে—বড় ঠুনকো, বড় আবদারী। এবার আর রূপ দেখব না,

বেশ শক্ত-পোক্ত মাঝারি গোছের মেয়ে আনব, যে সংসার আর সোয়ামী দুই ঘাড়ে তুলে নিতে পারবে।—বলিয়া সুধার দিকে তাকাইয়া বোধ হয় মনে মনে মাপ-জোপ করিতে লাগিলেন।

সুধা মুখ ফিরাইয়া লইয়া মনে মনে কহিল, এ পরের জিনিসে নজর দিয়ে কি হবে মা? তা ছাড়া তোমাদের সংসার কত বড় জানি না, কিন্তু শুধু ঐ স্বামীকেই ঘাড়ে বইবার মত শক্ত-পোক্ত মেয়ে বাংলা দেশে মিলবে কি?

কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া বৃদ্ধা কহিলেন, তোমার মা নেই, না?

সুধা ম্লান মুখে ঘাড় নাড়িল।

বৃদ্ধা কহিলেন, তাই এখনও বাপের কাছটিতে আছ। না হ'লে বয়েস তো তোমার কম হয় নি মা। বোধ হয়—

সুধা কহিল, সতরো।

বৃদ্ধা কহিলেন, তাই কম কি মা! আমাদের কালে বারো বছর পেরোলেই বাপ-মায়ের অন্নজল উঠে যেত, আজকাল চব্বিশেও চাড় পড়ে না। তা মা, তোমাকে আমার ভারি ভাল লাগছে। তোমার মত যদি একটি মেয়ে পেতাম!

সুধা কথা উল্টাইয়া দিয়া কহিল, ভূষণবাবুর ছোট মেয়েটিকে কে দেখছে?

একজন ঝি। বউমা বেঁচে থাকতেই এই ব্যবস্থা ছিল। নিজের রোগ নিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা প'ড়ে থাকত তো ছেলেপিলে দেখবে কখন?

সুধা কহিল, সত্যি, বেচারী ভারি ভুগত, ভূষণবাবু খুব সেবা করতেন।

বৃদ্ধা প্রবলভাবে ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে কহিলেন, সেদিকে আমার ভূষণের ত্রুটি পাবে না মা। বউদের ভারি আদর! এ কি বুড়ী মা যে,

ঘ'রে গেলেও মনে পড়বে না।—বলিয়া সক্ষোভে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, শুধু সেবা! কত টাকা খরচ করেছে! আজ পুরী, কাল ভুবনেশ্বর, তার ওপর এই কলকাতা শহরে মাসে মাসে তিন-চারশো টাকা খরচ ক'রে আজ এক বছর ধ'রে ব'সে আছে।

সুধা কহিল, তা আপনারা তো খুব বড়লোক শুনেছি।

আত্মপ্রসাদ ও গর্ব্বের আভায় বৃদ্ধার খাঁজ-কাটা মুখও কিঞ্চিৎ মসৃণ হইয়া উঠিল। কহিল, ঠিকই শুনেছ মা। যদি যাও তো নিজের চোখেই দেখতে পাবে। কর্ত্তারা যা রেখে গেছেন, ভূষণ অমন সাতটা বউয়ের চিকিচ্ছে করালেও কিছু হবে না, তবু দেখাশুনা করতে হবে মা। ভূষণ যে ম্যানেজার-গোমস্তার হাতে সব ছেড়ে চুপচাপ ব'সে আছে।

সুধা কহিল, তা এখন তো গেলেই পারেন।

বৃদ্ধা হাসিয়া কহিলেন, যাবে মা। তবে লক্ষ্মীছাড়া হয়ে যেতে ছেলের মন সরছে না। একটি তোমার মত লক্ষ্মী—

সুধা বাধা দিয়া কহিল, দেরি হয়ে গেছে, নীচে যাই, বাবা অনেকক্ষণ একা আছেন।

বৃদ্ধা সস্নেহে কহিলেন, যাও মা। দুপুরবেলা সময় পাও তো আমাদের বাড়িতে এস না কাল।

সুধা নীরস কণ্ঠে কহিল, আমার তো সময় হয় না।

বৃদ্ধা কহিলেন, বেশ, আমিই না হয় যাব মা।

তার পরদিন বিকালবেলায় বৃদ্ধা বেড়াইতে আসিলেন। বিশু হন্তদন্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়া আগেই খবর দিল, ভূষণবাবুর মা আসছেন। খুব বড়লোক, বেশ ক'রে খাতির ক'রো।

সুধা বিরক্ত হইয়া কহিল, এলেই বা। বড়লোক ব'লে সাষ্টাঙ্গে প'ড়ে থাকতে হবে নাকি? যা করবার আমি করব, তুমি নীচে যাও।

বিশু কাঁচুমাচু মুখে কহিল, যাচ্ছি, মানে ভূষণবাবু খুব বড়লোক কিনা, দোয়ানিবাবুর মত কিপটে নয়, একটা টাকা দিয়েছে আমাকে।

সুধা আগাইয়া আসিয়া বৃদ্ধাকে অভ্যর্থনা করিল এবং নিজের ঘরে লইয়া গিয়া কহিল, বসুন।

বৃদ্ধা চারিদিকে চাহিয়া কহিলেন, বসছি মা। এসেছি যখন, বসতে হবে বইকি। কিন্তু তোমার বাবার সঙ্গে একবার দেখা করা উচিত নয় কি?

দেখা করবেন? আচ্ছা, আসুন।—বলিয়া সুধা বৃদ্ধাকে লইয়া রাঘববাবুর ঘরে প্রবেশ করিল।

রাঘববাবু তাকিয়া ঠেস দিয়া চোখ বুজিয়া গড়গড়া টানিতেছিলেন। সুধা মৃদু কণ্ঠে ডাকিল, বাবা!

রাঘববাবু চোখ না খুলিয়াই জবাব দিলেন, কি মা?

ভূষণবাবুর মা এসেছেন।

রাঘববাবু সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া কহিলেন, আপনি এসেছেন! বসুন। ওরে সুধা, একটা বসতে কিছু দে মা। ভূষণবাবুর মুখে শুনেছিলাম—ভারি অনুগ্রহ আপনার। ক্ষোভের সহিত কহিলেন, নড়তে পর্য্যন্ত পারি না—না হ'লে আমারই উচিত দেখা করা, খোঁজ-খবর করা কি করব, ভগবান মেরেছেন।—বলিয়া মুখটি করুণ করিয়া তুলিলেন।

বৃদ্ধা স্ত্রীজনোচিত মৃদু কণ্ঠে কহিলেন, ভূষণের মুখে আপনার প্রশংসা আর ধরে না; বলে, খুব স্নেহ করেন আমাকে—ঠিক বাপের মত।—বলিয়া মনে মনে বোধ করি জিব কাটিলেন।

রাঘববাবু ঘাড়টি ঈষৎ নাড়িতে নাড়িতে কহিলেন, আমি আর বেশি কি করি! ভূষণের মত ছেলে যার কাছে যাবে, সেই স্নেহ করবে ও রকম সৎ ছেলে আজকাল দেখা যায় না।

রাঘববাবুর মুখে ভূষণের প্রশংসা শুনিয়া সুধা বিরক্ত হইল। মনে মনে বলিল, বাবার আজকাল শুধু ভূষণ আর ভূষণ, মনোজের নাম পর্য্যন্ত করেন না।

বৃদ্ধা একবার সুধার মুখের পানে কটাক্ষে চাহিয়া কণ্ঠস্বর একটু উচ্চগ্রামে চড়াইয়া কহিলেন, বেশ তো। আসুন, বদলাবদলি করি। রাঘববাবু বিস্মিত নয়নে তাকাইলেন। বৃদ্ধা হাসিয়া কহিলেন, আপনারা তো আমাদের পালটা ঘর, আমার ছেলেটিকে আপনি নিন, আপনার মেয়েটিকে আমায় দিন।

এতক্ষণে বৃদ্ধার বক্তব্য বুঝিতে পারিয়া রাঘববাবুর সারা মুখ আনন্দে উজ্জ্বল ও চোখ দুইটি কৃতজ্ঞতায় সজল হইয়া উঠিল; বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, গরিবের ওপর এ যে অসম্ভব দয়া! পুলকিত কণ্ঠে বৃদ্ধা কহিলেন, দয়া নয়, বোস মশাই। আপনার মেয়েটিকে আমার বড় ভাল লেগেছে, ছাড়তে ইচ্ছে করছে না আর।

সুধা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল, মনে হইল, প্রতিবাদ করে; কিন্তু স্ত্রীলোকের চিরন্তন লজ্জা তাহার জিহ্বা চাপিয়া ধরিল।

সেই রাত্রে সুধা মনোজকে তাড়া দিয়া চিঠি দিল।

দিন দুই পরে—হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া রাঘববাবুর জ্বর আসিল। সামান্য সর্দ্দিজ্বর ভাবিয়া রাঘববাবু নিজেই হোমিওপ্যাথি ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া খাইতে লাগিলেন। কিন্তু জ্বর দিন দিন বাড়িতে লাগিল এবং বুকের সর্দ্দি জমাট বাঁধিয়া পাথরের মত শক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। রাঘববাবু সুধাকে কহিলেন, নিমোনিয়া। আর বাঁচব না মা।

সুধা ভূষণকে ডাকাইয়া হাতের কয়েকগাছি চুড়ি তাহাকে দিয়া কহিল, এগুলো বিক্রি ক'রে দিতে পারেন?

ভূষণ আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, কেন?

বাবার চিকিৎসা করাতে হবে—হোমিওপ্যাথিতে হবে না।

ভূষণ চুড়িগুলা ফিরাইয়া দিয়া তিরস্কারের স্বরে কহিল, ছিঃ সুধা! তোমার বাবার চিকিৎসা করানো কি শুধু তোমারই দায়িত্ব, আমার নয়?

সুধা নীরস স্বরে কহিল, না না ভূষণবাবু, ওসব কথা ছেড়ে দিন, আমার বাবার দায়িত্ব আমার ওপরেই থাক্‌, আর কারও ভাগ নিয়ে কাজ নেই।

ভূষণ প্রবল বেগে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, বেশ কথা! সব ঠিকঠাক, এখন বলছ, ভাগ নিয়ে কাজ নেই! দুদিন পরে তো সবটাই নিতে হবে। যাকগে, এখন ও নিয়ে গোলমাল ক'রে লাভ নেই, তুমি তোমার বাবার কাছে গিয়ে ব'স, আমি ডাক্তার আনছি।—বলিয়া প্রতিবাদের অবসর না দিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

সুধাও অসুস্থ হইয়া পড়িল। সারাদিন শরীর ম্যাজম্যাজ করে, কিছুই খাইতে ইচ্ছা করে না। হঠাৎ একদিন দুপুরে ভাত খাইতে বসিয়া বমি করিয়া ফেলিল। ঝি মোক্ষদা তাড়াতাড়ি ধরিল ও মুখ ধোয়াইয়া, বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া চুপিচুপি কহিল, দিদিমণি, একটা কথা বলব? সুধা তাহার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু নয়নে চাহিল। ঝি একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, তোমার রোগ আমি ধরেছি। সুধা জবাব দিল না, নীরবে চাহিয়া রহিল। মোক্ষদা ফোকলা মুখে ফিক করিয়া হাসিয়া কহিল, তোমার খোকা হবে। সুধা বিস্ময় ও আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া, দুই চোখ ডাগর করিয়া কহিল, তাই নাকি? মোক্ষদা কহিল, হ্যাঁ, আমি এ রকম অনেক দেখেছি—ঠিক বলছি আমি।

বিবর্ণ মুখে সুধা কহিল, কি হবে মোক্ষদা?

এক মুহূর্তে মোক্ষদা দাসিত্বের নীচু ধাপ হইতে সখিত্বের সমপর্য্যায়ে

উঠিয়া আসিল; আশ্বাস দিয়া কহিল, কি আবার হবে? দাদাবাবুকে আসতে লিখে দাও। বিয়ে হয়ে গেলে আবার কিসের ভাবনা!

সেই রাত্রেই ভূষণের মা রাঘববাবুকে দেখিতে আসিলেন, সঙ্গে ভূষণ।

রাঘববাবু চোখ বুজিয়া পড়িয়া ছিলেন। বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন আছেন আজ?

রাঘব ক্লিষ্ট ও ক্লান্ত কণ্ঠে কহিলেন, ভাল নয়, বার্দ্ধক্যের বন্ধু না নিয়ে যাবে না বোধ হয়।

বৃদ্ধা আন্দাজে কথাটা বুঝিয়া কহিলেন, এত শিগগির গেলে চলবে কেন? মেয়ের বিয়ে দিয়ে তবে ছুটি।

রাঘববাবু কপালে হাত দিয়া কহিলেন, অদৃষ্টে থাকলে হবে। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, সুধারও শরীর ভাল নেই।

ভূষণ শতরঞ্জির উপর বসিয়া ছিল, একেবারে ফুটবলের মত লাফাইয়া উঠিয়া হুঙ্কার দিল, ভাল নেই মানে?

রাঘববাবু কহিলেন, কি জানি! সারাদিন কিছু খায় নি, এমনই শুয়ে আছে।

আচ্ছা, দেখছি আমি।—বলিয়া ভূষণ সুধার কক্ষে চলিল।

ভূষণ যাইতেই বৃদ্ধা কহিলেন, আমার মনে হয়, আশীর্ব্বাদটা হয়ে যাওয়াই ভাল, দিন চার পরে ভাল দিন আছে, ভূষণ পাঁজি দেখেছে।

রাঘববাবু কহিলেন, বেশ তো।

বৃদ্ধা কহিলেন, কার্ত্তিক মাসে তো বিয়ে হবে না, অগ্রাণের গোড়াতেই হবে। তা করতে করতে আপনিও সেরে উঠবেন।

দুপুর হইতে সুধা তাহার ঘরটিতে নির্জীবের মত বিছানায় পড়িয়া ছিল। ঘুমায় নাই, ঘুমাইতে পারে নাই। ক্রমাগত চিন্তার বুদ্বুদ উঠিয়া তাহার মনকে আন্দোলিত করিয়াছে,—একবারও স্থির হইতে

দেয় নাই। মোক্ষদার রোগনির্ণয় শুনিয়া প্রথমটা সে ঘাবড়াইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহার পর মোক্ষদার প্রবোধ-বাক্যে তাহার মন সায় দিয়া সান্ত্বনা মানিয়াছিল। সত্যই তো! ভাবনার কারণ কি! তাহাদের তো সত্যকার বিবাহ হইয়া গিয়াছে—শুধু গোটা কয়েক মামুলী মন্ত্র পড়া বাকি। দেহ ও মনের একান্ত মিলনই তো বিবাহ। সেদিক দিয়া তাহাদের কোন ত্রুটি আছে নাকি? তবে আর লজ্জা কিসের? হাঁ, ভয় আছে বটে—যদি মনোজ না আসে, যদি তাহাকে চিরদিনের মত ত্যাগ করে? কিন্তু মনোজ কি তাহা করিবে? মনোজের মুখের হাসি, চোখের দীপ্তি, আলিঙ্গনের আকুলতা এবং চুম্বনের প্রগাঢ়তা সমস্বরে আশ্বাস দেয়—মনোজ আবার আসিবে। তাহা ছাড়া সেদিন তো সে চিঠিতে লিখিয়াছে যে, যদি তাহার বাবা ও মার মত না হয়, তাহা হইলেও সে সুধাকে বিবাহ করিবে, সুধা যেন নিশ্চিন্ত থাকে। সুধা তো নিশ্চিন্তই আছে, কিন্তু আর বেশি দেরি করা উচিত হইতেছে না।

সুধা মনোজকে চিঠি লিখিল—বাবার ভারি অসুখ, আমারও অসুখ, পত্রপাঠ চ'লে এস।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরে মোক্ষদা খবর লইতে আসিল। মোক্ষদাকে দেখিয়া তাহার লজ্জা করিতে লাগিল—সে যেন তাহার জীবনের একটি অতি গোপন রহস্য জানিয়া ফেলিয়াছে। মোক্ষদা মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, কেমন আছ গো দিদিমণি? সুধা গম্ভীর মুখে কহিল, ভাল আছি। তারপর চিঠিটি তাহার হাতে দিয়া কহিল, এই চিঠিটা ডাকবাক্সে ফেলে দিও তো। জান তো, কেমন ক'রে ফেলতে হয়? মোক্ষদা দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া, ঘাড় কাত করিয়া কহিল, সব জানি দিদিমণি। দাদাবাবুকে নিখলে বুঝি? দাদাবাবু চিঠি পেয়েই চ'লে আসবে, তুমি কিছু ভেবো নি। মোক্ষদাকে বিদায় দিয়া সুধা

আবার ভাবিতে শুরু করিল। মনোজ আসিয়া কি বলিবে, কে জানে! যা দুষ্টু মানুষ, কত কি ঠাট্টা করিবে! এবারে সে স্পষ্ট বলিবে, আর দেরি নয় বাপু। বাবা-মার মত হোক আর না হোক, বিয়েটা হয়ে যাক। না হ'লে লোকে কি বলবে? বাবা-মাকে এত ভয় কিসের মনোজের? মনোজ যদি আপত্তি করে তো সুধা শুনিবে না, চোখের জল টানিয়া বাহির করিবে। তাহা হইলেই মনোজ জব্দ হইবে। একবার সে মুখভার করিয়াছিল বলিয়া মনোজের অস্থিরতার কথা তাহার মনে পড়িল। তাহাকে কাঁদিতে দেখিলে মনোজ সব করিতে পারে। বিবাহ হইয়া গেলে তাহারা এ বাড়িতে থাকিবে না, অন্য একটা ভাল বাড়ি ভাড়া করিবে। সেখানে কাহারও কর্তৃত্ব চলিবে না, এমন কি মনোজেরও না। একটি কথা বলিতে আসিলে সে এমন ধমক দিবে যে, মনোজ মুখটি চুন করিয়া থাকিবে। তারপর খোকা আসিবে—মনোজের মত সুন্দর, অমনই চঞ্চল, অমনই দুষ্টু। তখন আর মনোজের দিকে মন দেওয়ার সময় থাকিবে না, খোকাই সমস্ত দখল করিয়া বসিবে, খোকারই খবরদারি করিবার জন্য তাহার দিবারাত্র নিশ্বাস ফেলিবার সময় থাকিবে না। এমনই চিন্তা করিতে করিতে কখন দিনের আলো নিবিয়া আসিল, সুধা তাহা বুঝিতেও পারিল না। মোক্ষদা আসিয়া তাগিদ দিল, ও দিদিমণি! ওঠ গো, গা-হাত ধোও।

আজ আর ভাল লাগছে না।—বলিয়া সুধা শুইয়াই রহিল। সন্ধ্যার অন্ধকার জমাট হইয়া উঠিতে লাগিল, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে যে আনন্দময় সুরটি এতক্ষণ মনের মধ্যে বাজিতেছিল, তাহা থামিয়া গিয়া একটি হতাশাময় সুর বাজিতে লাগিল। যদি মনোজ আর না ফিরিয়া আসে? যদি তাহার হৃদয়ের সমস্ত মধু লুণ্ঠন করিয়া মধুকর পুষ্পান্তরে উড়িয়া যায়, তবে? যাহারা এতক্ষণ তাহাকে সরবে আশ্বাস দিতেছিল,

তাহাদের মুখের পানে তাকাইতেই, তাহারা ম্লান ও নত মুখে নীরব হইয়া রহিল। মনোজ হয়তো আসিবে না। মনোজ না আসিলে সে কি করিবে? ভূষণবাবুকে বিবাহ করিবে? ছিঃ ছিঃ! এতবড় অন্যায়, এতবড় অবিচার সে করিতে পারিবে না। বাবা যাহাই বলুন। কিন্তু তাহার পর? বাবা যদি সারিয়া না উঠেন, তবে? পৃথিবীতে কেহ আপনার বলিতে থাকিবে না। সমাজের দুর্য্যোধনের দল যখন তাহার শেষ লজ্জাবস্ত্রটুকু পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইবার জন্য টানাটানি করিবে, তখন সকলে নির্ব্বিকার দাঁড়াইয়া দেখিবে, অথবা তারিফ করিবে, তারপর যেদিন বিষাক্ত ক্ষতের মত সে সমাজের বুকের উপর দগদগ করিতে থাকিবে, তখন ঘৃণায় ধিক্কার দিবে।

এমন সময়ে কপালের উপর কাহার স্পর্শে চমকিয়া উঠিয়া সুধা সভয়ে কহিল, কে?

ভূষণ থতমত খাইয়া কহিল, আমি, মানে ভূষণ। ভয় কি?

সুধা উঠিয়া বসিয়া গায়ের কাপড় সামলাইয়া বিরক্তির সহিত কহিল, হঠাৎ কপালে হাত দিলেন যে?

ভূষণ লজ্জিতভাবে কহিল, কপালে হাতটা লেগে গেল, অন্ধকার কিনা। তা কেমন আছ? শুনলাম শরীর-খারাপ।

সুধা নীরস কণ্ঠে জবাব দিল, কে বললে আমার শরীর-খারাপ?

ভূষণ ঘাবড়াইয়া গিয়া কহিল, শরীর-খারাপ নয়? তবে যে তোমার বাবা বললেন, আচ্ছা, দেখি জিজ্ঞাসা ক'রে।

সুধা কহিল, শরীর একটু খারাপ হয়েছিল, এখন ভাল আছি।

ভূষণ যেন কৃতার্থ হইয়া গেল; একমুখ হাসিয়া কহিল, ভাল আছ? এমনই চিন্তা হয়েছিল!

সুধা ভ্রূ কুঁচকাইয়া কহিল, আমার অসুখে আপনার চিন্তা কেন?

ভূষণ দুই চোখ বড় করিয়া বিস্মিত মুখে কহিল, বা রে! আমার চিন্তা হবে না! কি বল! তারপর হাসিয়া কহিল, হেঃ হেঃ, সারাজীবন ধ'রে চিন্তা করবার ব্যবস্থা করছি।

এমন সময়ে বৃদ্ধা আসিয়া হাজির হইয়া উৎকণ্ঠিত স্বরে কহিলেন, কেমন আছ মা? শরীরটা কি খুবই খারাপ?

সুধা উঠিয়া দাঁড়াইয়া মুখ নামাইয়া কহিল, আজ্ঞে না, ভাল আছি।

বৃদ্ধা তাহাকে সস্নেহে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া কহিলেন, মুখটি শুকিয়ে গেছে। একা রাত জাগতে হচ্ছে, তাই বোধ হয় শরীর-খারাপ হচ্ছে। ভূষণ, তুই তো—

বলিতে হইল না, ভূষণ সোৎসাহে কহিল, নিশ্চয়ই, আমি আজ থেকেই আসব।

সুধা বাধা দিয়া কহিল, না না, কিছু দরকার নেই। রাত জাগতে তো হয় না। পাশে থেকে ঘুমুই, বাবা দরকার হ'লে উঠিয়ে দেন।

বৃদ্ধা কহিলেন, বেশ। কিন্তু দরকার হ'লেই ব'লো মা, লজ্জা ক'রো না। ভাল-ভালস্তে দু হাত এক হয়ে গেলেই তোমার বিপদ তো ভূষণকেই ঘাড় পেতে নিতে হবে মা।—বলিয়া ভূষণের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, রাঘববাবুর মত হয়েছে। ওই দিনেই আশীর্ব্বাদ হবে।

অপ্রত্যাশিত আনন্দে ভূষণের চোখ দুইটা জ্বলিয়া উঠিল, আগ্রহভরা কণ্ঠে কহিল, সত্যি?

সুধা কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বৃদ্ধা কহিলেন, আজ আসি, মা, কাল আবার আসব।

ভূষণ মাকে কহিল, মা, শরীরটার সম্বন্ধে একটু—

বৃদ্ধা পুত্রের অত্যধিক দরদ দেখিয়া বোধ করি ক্ষুণ্ণ হইলেন, তবু যতদূর সম্ভব স্নেহের সহিত কহিলেন, হ্যাঁ মা, সাবধানে থেকো।

মাতা ও পুত্রকে বিদায় দিয়া সুধা রাঘববাবুর কাছে আসিয়া বসিল।

রাঘববাবু কহিলেন, কিছু খেয়েছিস মা ?

সুধা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ। রাঘববাবু কহিলেন, রাত জাগার জন্যেই হয়েছে বোধ হয়। আজ আর রাত জেগো না, আমি তো এমনই বেশ থাকি।

সুধা নীরবে বাবার বুকে হাত বুলাইতে লাগিল।

রাঘববাবু কহিলেন, ভূষণের মা আশীর্ব্বাদের দিন স্থির ক'রে গেলেন।

সুধা বিরক্তির সহিত কহিল, না বাবা, এখন থাক্। তুমি সেরে না উঠলে ওসব কিছু হবে না। রাঘববাবু কন্যার পিঠে একবার হাত বুলাইয়া কহিলেন, আর যদি আমি সেরে না উঠি মা ? তোমাকে এমন অসহায় ফেলে গিয়ে আমি যে ম'রেও শান্তি পাব না। সুধা কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল, না বাবা, ওসব কথা ব'লো না, আমার মনে যে কি হচ্ছে !—বলিয়া আঁচলে মুখ চাপিল।

দিন দুই পরে। সন্ধ্যার সময়ে সুধা ছাদে একলাটি চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। দুই দিনেই চেহারা শীর্ণ ও মলিন হইয়া গিয়াছে; চোখের কোলে কালি জমিয়াছে, মাথার চুল রুক্ষ ও বিশৃঙ্খল। দেহ ও মন দুইই অত্যন্ত ক্লান্ত। আজ সারাদিন প্রত্যেক মুহূর্ত্ত সে মনোজের আসার আশা করিয়াছে। কত জনের পায়ের শব্দ, গলার স্বর শুনিয়া কত বার সে চমকিয়া উঠিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। মনোজ আজও আসে নাই বা কোন চিঠি দেয় নাই। কাল রাত্রি হইতে রাঘবের অবস্থাও খারাপের দিকে চলিয়াছে। ভূষণ সকালে ডাক্তার ডাকিয়া আনিয়াছিল; ডাক্তার ঔষধ দিয়াছে, কিন্তু আশা দেয় নাই। সুধার চিন্তার সীমা নাই। মনোজ আসিল না কেন ? বাবা-মায়ের মত করিতে পারে নাই, সেইজন্যই বোধ হয় পাছু হটিয়াছে। প্রেম করিবার সময়ে বাপ-মায়ের কথা ছেলেদের

মনে পড়ে না। প্রেমের দায়িত্ব ঘাড়ে পড়িতে আসিলেই বাবা-মাকে ঠেকাইয়া দিয়া গা-ঢাকা দেয়। কিন্তু মনোজ কি অন্য সকলের মত অপদার্থ, হৃদয়হীন? সুধা তাহা কোন দিন ভাবে নাই, কোন দিন ভাবিতে পারিবে না। আকাশে শুক্লা সপ্তমীর চাঁদ উঠিয়াছিল, তাহারই স্বল্প আলোকে বাম হাতের অনামিকায় সোনার আংটিটি চিকচিক করিতে লাগিল। সেই দিকে তাকাইয়া সুধার সেই দিনের সন্ধ্যাটির কথা মনে হইল, যেদিন মনোজ তাহাকে আংটিটি পরাইয়া দিয়াছিল। আজও তেমনই সন্ধ্যা, আকাশ তেমনই প্রশান্ত নীল; আকাশের বুকে তেমনই অগণিত তারা, তেমনই চাঁদ; কিন্তু সেদিন হাতে মিলিয়াছিল হাত, হৃদয়ে মিলিয়াছিল হৃদয়; আর আজ দুইটি হৃদয়ের মাঝে শত ক্রোশের ব্যবধান, হয়তো শত জীবনের ব্যবধান।

হঠাৎ সিঁড়িতে কাহার পদশব্দ শোনা গেল। তবে কি মনোজ আসিয়াছে? সুধা কান পাতিয়া রহিল। নিশ্চয় তাহার জুতার শব্দ। সুধার বুকের ভিতরে ঘোড়-দৌড় শুরু হইল, সর্ব্বশরীর থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সুধা কি করিবে? সুধা কি ছুটিয়া যাইবে? বলিবে, আসিয়াছ? এতদিনে মনে পড়িয়াছে? বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বলিবে, আমাকে একান্ত করিয়া লও, আমার আর কেহ নাই? হঠাৎ ঘনঘটা করিয়া অভিমানের মেঘ ঘনাইয়া আসিল। সুধা যাইবে না, এইখানে এমনই করিয়া বসিয়া থাকিবে। কেন মনোজ তাহাকে এত ভাবাইয়াছে? সুধা আঁচলে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া রহিল।

জুতার শব্দ কাছে আসিয়া থামিল। ইহার পর? জলভরা মেঘ দেখিয়া বারিবর্ষণের আশায় সারা পৃথিবী যেমন উন্মুখ হইয়া উঠে, তেমনই মনোজের স্পর্শের আশায় সুধার সমস্ত শরীর উন্মুখ হইয়া উঠিল। হঠাৎ মেঘ-গর্জ্জনের মতই গলা-খাঁকারির শব্দ হইল।. মনোজ তো নয়। তবে?

সুধা চোখ মেলিয়া দেখিল, তাহার একান্ত কাছে দাঁড়াইয়া ভূষণ ; তাহার দিকে—শক্ত রোগে অনেক দিন অনশনের পর রোগী অন্নপথ্যের দিকে যেমন করিয়া তাকায়, ঠিক তেমনই ভাবে তাকাইয়া আছে। কলপ-মাখানো চুল তেল দিয়া পালিশ করিয়াছে ; দাড়ি-গোঁফ নির্ম্মূল করিয়া কামাইয়াছে ; গায়ে আজানুলম্বিত ঝকঝকে তসরের পাঞ্জাবি, এবং পায়ে চকচকে পেটেণ্ট লেদারের পাম্প-শু পরিয়াছে।

সুধা ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া ভীত ও সন্ত্রস্ত স্বরে কহিল, আপনি এখানে কেন ?

ভূষণ হাসিয়া কহিল, আমি ? রাঘববাবুকে দেখতে এসেছি।

বেশ তো, তাঁর ঘরে যান।

ভূষণ তাহার ফোলা ফোলা চোখের দৃষ্টি যতদূর সম্ভব ঘন করিয়া কহিল, শুধু কি তাঁকেই দেখতে এসেছি সুধা ? তোমাকেও।

সুধা শক্ত হইয়া কহিল, আমাকে দেখবার কি দরকার আপনার ?

ভূষণ দুই হাতে বুক চাপিয়া, ঘাড় হেলাইয়া, চক্ষে মিনতি ভরিয়া, গাঢ় কণ্ঠে কহিল, তা কি তুমি বোঝ নি সুধা ? তোমাকে ভালবাসি যে।

সুধা মনে মনে কহিল, ভালবাসা নম্বর দুই, মধুকরের পর মত্তহস্তী, একজন লুণ্ঠন করিয়া পলাইয়াছে, আর একজন পেষণ করিবার জন্য পা বাড়াইয়াছে।

ভ্রূ কুঁচকাইয়া সুধা কহিল, সত্যি ভালবাসেন ?

আগেকার পোজেই এক পা আগাইয়া মস্তক আন্দোলিত করিয়া ভূষণ কহিল, সত্যি সুধা। তারপর দুই হাতের আঙুলগুলা বিদারণ-ভঙ্গীতে বাঁকাইয়া কহিল, যদি বুক চিরে দেখতে পারতাম, দেখতে পেতে—

সুধা হাসিয়া ফেলিয়া শ্লেষের সহিত কহিল, কার ছবি আঁকা আছে এ বক্ষ মাঝারে, না ভূষণবাবু ?

ভূষণ হাঁ-সূচক ঘাড় নাড়িল।

সুধা কহিল, কিন্তু আপনার সেদিনকার স্ত্রীকেও তো খুব ভালবাসতেন দেখেছি। তাঁর ছবিও নিশ্চয় ওখানে আঁকা আছে?

পোজ পরিত্যাগ করিয়া ভূষণ লজ্জিতভাবে কহিল, তা আছে সুধা।

আর আপনার প্রথম স্ত্রী? তাঁর ছবি?

ভূষণ অপ্রতিভ হইয়া কহিল, তা—তা—তারও আছে বোধ হয়।

সুধা বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া কহিল, তা হ'লে তো আপনার হৃদয়টিতে আপনি একটি চিত্র-ভবন খোলবার চেষ্টায় আছেন দেখছি। পরক্ষণেই গম্ভীর হইয়া কহিল, তা বেশ করেছেন ভালবেসেছেন, কিন্তু—

ভূষণ প্রবল বেগে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, কিন্তু-টিন্তু নয় সুধা। আশীর্ব্বাদের দিন সব ঠিক।

সুধা কহিল, তা হোক, কিন্তু আপনার আগেই যে আর একজন আমাকে ভালবেসে ব'সে আছে।

ভূষণ আঁতকাইয়া উঠিয়া কহিল, আর একজন? কে সে? ওঃ, সেই সিটকে ছোঁড়া তো? তা হোক সুধা, তাকে আমি পেরে উঠব।—বলিয়া আস্তিন গুটাইল।

সুধা ফিক করিয়া হাসিয়া কহিল, মল্লযুদ্ধ করবেন নাকি? কিন্তু তাতে কোন ফল হবে না ভূষণবাবু, আমিও যে তাকে ভালবাসি। আর শুধু ভালবাসি কেন, আমাদের বিয়েও হয়ে গেছে।

দুই চোখ কপালে তুলিয়া প্রবল বিস্ময়ের সহিত ভূষণ কহিল, অ্যাঁ! বিয়ে হয়ে গেছে! তবে যে রাঘববাবু—

সুধা ধীরে ধীরে কহিল, বাবা জানেন না।

অত্যন্ত অবিশ্বাসের সহিত ভূষণ কহিল, পাগল! তা কি হয়, বাবা জানবে না, আর মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবে!

সুধা দৃঢ় কণ্ঠে কহিল, আমি সত্যি বলছি, বিশ্বাস করুন, আমার বিয়ে হয়ে গেছে। আর কাউকে বিয়ে করবার আমার উপায় নেই।

ভূষণের মুখের ভাব কঠিন হইয়া উঠিল; ক্রোধমিশ্রিত স্বরে কহিল, তবে তোমরা ধাপ্পা দিয়ে আমাকে এত দৌড়-ঝাঁপ করালে কেন? এত পয়সাই বা খরচ করালে কেন? তা ছাড়া মাকে এমন ক'রে ঠকালে কেন?

সুধা নীরস কণ্ঠে কহিল, ধাপ্পা আমরা কাউকে দিই নি, ঠকাতেও কাউকে চাই নি। যা কিছু আপনি নিজে হতেই করেছেন। আর খরচ? কত খরচ হয়েছে আপনার, বলুন?

ভূষণ নাসিকা উঁচাইয়া ঝাঁজালো স্বরে কহিল, তার কি হিসেব রেখেছি নাকি? জান না, কত খরচ হয়েছে? তোমাদের সমস্ত পূজোর খরচ কে চালিয়েছে? ডাক্তারের ফী দেবার সময় ছিলে কোথায়? তা ছাড়া ওই বিশে হতভাগা কি কম টাকা নিয়েছে আমার কাছ থেকে!

সুধা কহিল, বেশ। আমাকে একটা হিসেব দেবেন। আমি সব আপনাকে দিয়ে দোব।

মুখ ভ্যাংচাইয়া ভূষণ কহিল, দিয়ে দোব! টাকার গাছ আছে কিনা বাড়িতে! জানতে কিছু বাকি নেই।

হাতের কয়েকগাছি চুড়ি খুলিয়া ভূষণের দিকে বাড়াইয়া দিয়া সুধা কহিল, নিন, আশা করি, এতে আপনার ধার শোধ হবে।

ভূষণ হাত নাড়িয়া কহিল, থাক্ থাক্, ঢের হয়েছে, আর সাধুগিরি দেখিয়ে কাজ নেই। ব্যঙ্গের স্বরে কহিল, রেখে দাও তোমার ব্যাঙের আধুলি, আখেরে কাজ দেবে, অনেক কষ্ট আছে কিনা কপালে তোমার।

সুধা ঈষৎ হাসিয়া কহিল, থাকলেই বা কি করব ভূষণবাবু, উপায় কি? কিন্তু আপনি আর দাঁড়িয়ে থেকে সময় নষ্ট করছেন কেন?

আর একটি মেয়ে-টেয়ে ঠিক করুনগে। নইলে আশীর্ব্বাদের আয়োজনটা পণ্ড হয়ে যাবে যে।

কড়া গলায় ভূষণ কহিল, তা যাক, তোমাকে তার জন্যে ভাবতে হবে না। ফাজিল মেয়ে কোথাকার! তারপর যাইতে উদ্যত হইয়া আবার ফিরিয়া কহিল, সত্যি তো? ভূষণ ঘোষ ভারি জেদী লোক—একবার পা বাড়ালে আর ম'রে গেলেও ফিরবে না কিন্তু।

সুধা কহিল, আপনার ফেরবার দরকার হবে না ভূষণবাবু। আমার স্বামী শিগগির এসে পড়বেন।

ভূষণ ভ্রূকুটি-ভীষণ মুখে কহিল, স্বামী! ঘাড়ের রক্ত চুষে খেয়ে এর পর স্বামী দেখানো হচ্ছে! স্বামী এর পর আসবেন বইকি। কাজ গোছানো হয়ে গেছে যে! হাঁকিয়া কহিল, দু পাতা ইংরিজী প'ড়ে উচ্ছন্ন গেছ তোমরা, কিছু অসাধ্যি নেই তোমাদের।

সুধা তীব্র চাপা স্বরে কহিল, গোলমাল করবেন না ভূষণবাবু। বাড়ি যান। আপনি আমাদের অনেক উপকার করেছেন, তার জন্যে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমাকে বিয়ে করতে না পেরে যদি মনে সত্যি কষ্ট হয়ে থাকে তো মনে করবেন, বিয়ে করেছেন, আমি ম'রে গেছি। দুদিন সামলে চতুর্থ পক্ষের জন্যে চেষ্টা করবেন। জোটাতেও দেরি হবে না। আর টাকা? আমি সুদে আসলে সব টাকা আপনার পাঠিয়ে দোব, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

ভূষণ সুধার দিকে অগ্নি-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল, খুব বক্তিমে হয়েছে! মেয়ের ভাবনা ভূষণ ঘোষ করে না, একবার হাঁক দিলে দুশো মেয়ে পায়ে লুটিয়ে পড়বে। আর টাকা? টাকা একবার নিয়ে সবাই দেয়, লোক চিনতে বাকি নেই ভূষণ ঘোষের।—বলিয়া আপন মনে গজগজ করিতে করিতে ভূষণ নামিয়া গেল।

তাহার পরদিন বিকালে বিশু হন্তদন্ত হইয়া আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল, ভূষণবাবুরা চ'লে যাচ্ছে।

সুধা নিজের ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, কোন জবাব দিল না।

বিশু বলিতে লাগিল, মোটঘাট বাঁধা হচ্ছে, আজ রাত্রেই পালাবে বোধ হয়।

সুধা শুধু কহিল, বেশ তো।

বিশু ভাবিয়াছিল, ভূষণের পলায়ন-সংবাদ শুনিয়া সুধা চঞ্চল হইয়া উঠিবে, কিন্তু তাহার নির্বিকার ভাব দেখিয়া সে দমিয়া গেল। কহিল, তা হ'লে বিয়ে হবে না?

সুধা বিরক্ত হইয়া কহিল, সে ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না, তুমি যাও।

বিশু কাঁচমাচু হইয়া কহিল, যাচ্ছি, কিন্তু ভূষণবাবু এত চ'টে গেল কেন বল দেখি?

সুধা কহিল, চটার পরিচয় পেলে কি ক'রে?

বিশু মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে কহিল, মানে, একটা টাকা চাইতে গিছলাম, তো তেড়ে মারতে এল।

সুধা রুষ্ট স্বরে কহিল, ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে যার-তার কাছে ভিক্ষে করতে লজ্জা করে না?

বিশু আমতা আমতা করিয়া কহিল, ভিক্ষে তো নয়, নিজের লোক ব'লেই—মানে, সব এমন ঠিক হয়েও যে ভেঙে যাবে, কে জানে!—বলিয়া সরিয়া পড়িল।

নরনারীর মিলন-ব্যাপারে বাধা ও বিঘ্নের বিপুলতা বিশুর মত জগতে আর কাহাকে বুঝিতে হইতেছে?

রাঘববাবু সারাদিন আচ্ছন্নের মত পড়িয়া ছিলেন। সন্ধ্যার সময়

সুধা যখন বুকে মালিশ করিতেছিল, তখন ক্ষীণ কণ্ঠে কহিলেন, কেমন আছিস মা ?

সুধা কহিল, ভাল আছি বাবা।

ভূষণ আজ সারাদিন আসে নি, কোন কাজ-টাজ আছে বোধ হয় !

সুধা কহিল, ওঁরা সব দেশে চ'লে গেছেন।

রাঘব ঘোলাটে চোখ দুইটি মেলিয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন।

সুধা কহিল, দেশে জমিদারির কি কাজ আছে।

রাঘববাবু কহিলেন, আবার আসবে তো ?

সুধা আশ্বাস দিয়া কহিল, আসবেন বইকি ? কাজ সেরেই আসবেন। আমাকে ব'লে গেলেন।

রাঘববাবু দুই চোখ বুজিয়া নির্জ্জীব কণ্ঠে কহিলেন, আমাকে একটি বার ব'লে গেল না !

পরের দিন ভোরে রাঘববাবু মারা গেলেন। মৃত্যুর সময়ে কোন কথা বলিতে পারিলেন না ; শুধু দুইটি ব্যাকুল নয়ন মেলিয়া কন্যার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। চোখের কোণ হইতে জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল ; ঠোঁট দুইটি থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল ; এবং শীর্ণ, শীতল মুষ্টিতে মেয়ের হাতটি তিনি প্রাণপণে ধরিয়া রহিলেন। সুধা নিঃশব্দে নির্নিমেষ নয়নে বাবার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল, কাঁদিল না ; শুধু পরম মমতার সহিত রাঘবের মাথায় ও মুখে হাত বুলাইতে লাগিল। তারপর যখন সব শেষ হইয়া গেল, ধীরে ধীরে মৃতের চোখ দুইটি নিমীলিত করিয়া দিয়া সর্ব্বাঙ্গ চাদর দিয়া ঢাকিয়া দিল।

বিশু দরজার পাশেই বসিয়া বিড়ি টানিতেছিল। সুধা ডাকিয়া কহিল, বিশুদা, সব তো শেষ হয়ে গেল, পাড়ার সবাইকে খবর দাও।

বিশু বিড়িটায় শেষ টান দিয়া কহিল, তাই নাকি? আচ্ছা।—বলিয়া হঠাৎ প্রাণপণ চীৎকারে পাড়া প্রকম্পিত করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, ওরে বাবা রে! কি হ'ল রে! মামা যে আমার ম'রে গেল রে!

বিশুর এই ব্রড্‌কাস্টের পর কাহারও বিছানায় শুইয়া থাকা সম্ভব হইল না। একে একে সকলে জুটিতে লাগিল। পাড়ার সৎকার-সমিতি খবর পাইয়া সদলবলে আসিয়া হাজির হইল। সকলের সমবেত চেষ্টায় রাঘববাবুর শেষকৃত্যে কোন ত্রুটি রহিল না।

পরের দিন সকালে নিজের ঘরটিতে সুধা চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। তাহার ভাবনার সীমা-পরিসীমা ছিল না। মনোজ আজও আসিল না, বোধ হয় আর সে আসিবে না। কেন আসিবে? সুধাকে আর কিসের প্রয়োজন? দিন কয়েক ভালবাসার ভান করিয়া সুধার সর্ব্বনাশ করিয়া সে হয়তো এখন অন্য নারীর পিছনে ছুটাছুটি শুরু করিয়াছে। কিন্তু কি করিবে সে? কোথায় যাইবে? হাতে যাহা কিছু ছিল, বাবার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়াতে সব খরচ হইয়া গিয়াছে। বাড়িওয়ালা বাকি ভাড়ার জন্য আসিয়াছিল, তাহাকে অনেক কষ্টে বিদায় করিয়াছে। মোক্ষদাকে দিয়া কোন স্যাকরাকে ডাকিয়া গায়ের গহনা বিক্রয় করিয়া তাহার দেনা শোধ করিতে হইবে। আর দিন কয়েক পর এ বাড়ি ছাড়িয়া দিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে হইবে। ঝি-ঠাকুরকেও বিদায় দিতে হইবে, তারপর—

মোক্ষদা একটি চিঠি আনিয়া হাতে দিয়া কহিল, বোধ হয় দাদাবাবুর চিঠি দিদিমণি।

সুধা নির্ব্বিকারভাবে হাত বাড়াইয়া চিঠিটা লইয়া কোলের উপর রাখিল। মোক্ষদা কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া চলিয়া গেল। সুধা তেমনই বসিয়া রহিল। মনোজের চিঠিতে কি লেখা আছে, সুধা যেন না পড়িয়াই বুঝিল। হয়তো লিখিয়াছে—মা-বাবার মত নাই বলিয়া

আসিতে পারিতেছে না, একমাত্র সন্তান হইয়া মাকে দুঃখ দিতে তাহার মন চাহিতেছে না। অতএব সব দুঃখ সুধাই ভোগ করুক। তারপর বিনাইয়া বিনাইয়া ভালবাসা জানাইয়াছে, এবং কল্পনা ও কবিত্বের যদি বিশেষ মাত্রাধিক্য হইয়া থাকে তো পরলোকে মিলন হইবে—এই আশা দিয়া ইহলোকে জীবনটা এক রকম করিয়া কাটাইয়া দিবার পরামর্শ দিয়াছে।

কিছুক্ষণ পরে চিঠিটা তুলিয়া লইয়া দেখিল, ঠিকানা মনোজের হাতের লেখা নহে; তবে কে চিঠি দিল আবার? খামটা ছিঁড়িয়া দেখিল, মনোজের চিঠি নয়, মনোজের মার চিঠি, লিখিয়াছেন—

সুধার চিঠি যথাসময়ে পৌছিয়াছে। মনোজ বাড়িতে নাই। বৈষয়িক কাজে অন্যত্র গিয়াছে। সুধার চিঠি তাহার কাছে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মনোজের কাছে সুধার কথা তিনি শুনিয়াছেন। সুধাকে দেখিতে তাঁহার খুব ইচ্ছা হয়। ভগবান যদি সব ভাল রাখেন, শীঘ্রই বোধ হয় সে সুযোগ হইবে। কারণ মনোজের এক জমিদারের একমাত্র কন্যার সহিত বিবাহ স্থির হইয়াছে এবং শীঘ্রই বিবাহ হইবে। বিবাহে সুধা ও তাহার বাবাকে নিশ্চয় আসিতে হইবে। মনোজেরও ইহা একান্ত ইচ্ছা।

চিঠি পড়া হইয়া গেল। তবুও সেই চিঠিটার দিকে সুধা অনেকক্ষণ বিহ্বলভাবে তাকাইয়া থাকিল, তারপর সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, যাক, বাঁচা গেল। সকল আশার শেষ হইয়া গেল। তৈলহীন প্রদীপের স্বল্প সলিতাটুকু উস্কাইয়া উস্কাইয়া ক্ষীণ আলোটুকু বাঁচাইয়া রাখার চেয়ে অন্ধকার ঢের ভাল। আসুক মসীকৃষ্ণ গাঢ় স্নিগ্ধ অন্ধকার, এ জীবন নিঃশেষে তলাইয়া যাক সেই অন্ধকারের মধ্যে; বাঁচিতে বিন্দুমাত্র সাধ নাই সুধার।

কিন্তু মনোজ? রূপবতী রাজকন্যা ও রাজত্ব পাইয়া একেবারে ভুলিতে পারিল সুধাকে? সুধার কি হইবে, একবারও ভাবিয়া দেখিল না? একবারও ভাবিল না, ভোজের শেষে উচ্ছিষ্ট কলাপাতার মত পথের কুকুরের ক্ষুন্নিবৃত্তি করা ছাড়া তাহার আর কোন গতি রহিল না? কিন্তু মনোজ তো অস্বাভাবিক কিছুই করে নাই। নারীর দেহটার উপরেই তো চিরদিন পুরুষের লোভ। পাইলে এক চুমুকে রস রক্ত ও মজ্জা, সব শোষণ করিয়া লইয়া শুষ্ক দেহটাকে ফেলিয়া দিয়া যায়; একবার ফিরিয়া তাকাইয়াও দেখে না, কি হইল সেই দেহটার। এই দুর্নিবার দুরন্ত লোভকে বশে আনিবার জন্য সমাজ তাহাকে আষ্টেপৃষ্ঠে শিকল দিয়া বাঁধে, রাষ্ট্র শাসনদণ্ড চক্ষের সম্মুখে উদ্যত করিয়া রাখে। তাই পুরুষের চক্ষে ঘনায় প্রেমাশ্রু, গড়িয়া উঠে গৃহ, রচিত হয় নারীর ভুলের স্বর্গ। বেশ করিয়াছে মনোজ তাহাকে ঠকাইয়াছে। যেমন নির্ব্বোধের মত নিজের সর্ব্বস্ব তাহার সামনে মেলিয়া ধরিয়াছিল, তাহার উপযুক্ত শাস্তি দিয়াছে সে। শুধু কি শাস্তি? বিবাহে নিমন্ত্রণ করিয়া অপমানও করিয়াছে। ভাবিয়াছে, সুধার তো কেহ নাই, কিছুই নাই, তাহার আর মান-অপমান কি? মনোজ শুধু নিষ্ঠুরই নহে, নীচ। সমাজ কিন্তু এই নিষ্ঠুরতার, এই নীচতার জন্য কোন শাস্তি দিল না, দিল প্রচুর পুরস্কার; আর মেয়েমানুষ বলিয়া সব শাস্তি হইল সুধার। মনোজকে সুধা যদি আজ হাতের কাছে পাইত, তাহা হইলে—। হঠাৎ রাগে দেহের রক্তস্রোত মাথার মধ্যে বার কয়েক ঘুরপাক খাইয়া গেল; সুধা একটা চিঠির কাগজ লইয়া লিখিল—

নিমন্ত্রণের জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু আমাদের যাইবার উপায় নাই। আমার কন্যা সুধার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে বিবাহসম্বন্ধ স্থির হইয়াছে। অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম লগ্নেই বিবাহ হইবে। বিবাহে মনোজ আসিলে

অত্যন্ত আনন্দিত হইব। সুধারও আনন্দের সীমা থাকিবে না।···
নিঃ—রাঘবচন্দ্র বসু

সুধা মোক্ষদাকে দিয়া চিঠিটা ডাক-বাক্সে ফেলিতে পাঠাইয়া দিল। মোক্ষদা জিজ্ঞাসা করিল, দাদাবাবু কবে আসবে দিদিমণি?

সুধা গম্ভীরভাবে কহিল, জানি না। তাহার ভাব দেখিয়া মোক্ষদা আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না।

সন্ধ্যার পর অন্ধকার ঘরে সুধা চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। মনোজের উপর এখন আর তাহার বিন্দুমাত্র ক্রোধ ছিল না, ছিল নিরতিশয় অভিমান। কেন একবার আসিলে না? আসিয়া যদি বলিতে, আমি আর তোমাকে ভালবাসি না, তাহা হইলে আমি তোমাকে ধরিয়া রাখিতাম না। তোমার সন্তানের জন্য পিতৃত্বের পরিচয়টুকু মাত্র লইয়া তোমাকে মুক্তি দিতাম। তারপর সেই সন্তানকে একদিন মানুষের মত মানুষ করিয়া তোমারই হাতে তুলিয়া দিয়া নিজে জন্মের মত মুক্তি লইতাম। কেন আমাকে সব দিক দিয়া নষ্ট করিয়া দিলে? হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া সুধা শুনিল, কে বলিতেছে, কিছু ভেবো নি দিদিমণি। চাহিয়া দেখিল, কাছে দাঁড়াইয়া মোক্ষদা। সুধা জবাব দিল না।

মোক্ষদা বলিতে লাগিল, নাই বা এল দাদাবাবু; ভয় কিসের? সব ব্যবস্থা আমি ক'রে দোব।

সুধা বিস্ময়ের সহিত কহিল, কি?

মোক্ষদা একগাল হাসিয়া কহিল, কি আবার! তুমি যেন কিছু বোঝ নি! এত নেকাপড়া শিখেছ! দুদিনে একেবারে নিস্‌খাস হয়ে যাবে। কেউ টেরটি পর্য্যন্ত পাবে না।

সুধা এতক্ষণে বুঝিতে পারিয়া গভীর ঘৃণার সহিত কহিল, ছিঃ মোক্ষদা, তুমি না মেয়েমানুষ!

মোক্ষদা কণ্ঠস্বর অশ্রুতে স্যাঁতসেঁতে করিয়া কহিল, মেয়েমানুষ ব'লেই তো বলছি দিদিমণি। মেয়েমানুষ ছাড়া মেয়েমানুষের দুঃখু আর কে বুঝবে, বল? তারপর স্বাভাবিক কণ্ঠে আশ্বাস দিয়া কহিল, কিছু ভয় নেই তোমার। লজ্জাই বা কিসের? আজকাল ভদ্রলোকদের বাড়িতে আকছার হচ্ছে। তারপর কণ্ঠস্বর নিখাদে নামাইয়া কহিল, তবে কিছু খরচ করতে হবে।

সুধা তীক্ষ্ণ স্বরে কহিল, আচ্ছা মোক্ষদা, তোমার ছেলেমেয়ে আছে?

মোক্ষদা কহিল, আছে বইকি দিদিমণি। কিন্তু ছেলে নয়, মেয়ে। পরক্ষণেই কান্নার স্বরে কহিল, কিন্তু এমনই পাষাণ মেয়ে যে, মায়ের দিকে চোখ পেড়ে তাকায় না; না হ'লে কি এই বুড়ো বয়েসে দাসীবিত্তি করতে হয় দিদিমণি! যেমন তেমন মেয়ে নয় আমার, কেমন বাবু, কত—

বাধা দিয়া সুধা কহিল, আমার যা কিছু আছে, সব যদি তোমাকে দিই, তা হ'লে একটি কাজ করতে পার?

মোক্ষদা বিস্ময়াহত কণ্ঠে কহিল, কি দিদিমণি?

মেয়ের বাড়ি গিয়ে তার খাবারে বিষ মিশিয়ে দিয়ে আসতে পার?

মোক্ষদা দুই চোখ কপালে তুলিয়া কহিল, ও কি কথা দিদিমণি? মেয়ে আমাকে নাই বা দেখল, তবু তো পেটের মেয়ে। আমার দিন এমনই ক'রেই কাটবে, সে আমার সুখে স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাক্।

তবে আমাকে ও কথা বলছ কেন?

মোক্ষদা হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, দিদিমণির যেমন কথা! কিসে আর কিসে! যতক্ষণ পেটে, ততক্ষণ তো রক্তের ঢেলা। চোখে না দেখলে আর মায়া কিসের?

সুধা চুপ করিয়া রহিল। ভাবিল, মোক্ষদা বলে কি? দেহের

অন্তরালে আছে বলিয়া সন্তানের উপরে মায়া হইবে না? যে অহরহ তাহার সারা অন্তর জুড়িয়া বসিয়া আছে, যাহার স্পর্শ পাইবার জন্য সমস্ত দেহ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, যাহার জন্য প্রতিদিন পলে পলে স্নেহে মন ও সুধায় বুক ভরিয়া উঠিতেছে, যাহার আগমন-বার্তা পাইয়া তাহার সমস্ত জীবন প্রভাতের পদ্মের মত বিকচোন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে, তাহার উপর মায়া হইবে না তো হইবে কাহার উপর? মিথ্যা মা হইয়াছে মোক্ষদা।

মোক্ষদা কহিল, মনটা একটু শক্ত কর দেখি। দুদিন পরে—যেমনটি আগে ছিলে, ঠিক তেমনিটি হয়ে যাবে। তারপর—

সুধা মোক্ষদার মুখের দিকে তাকাইল।

সে বলিয়াই চলিয়াছিল, বিয়ে করবে। সুধা নীরবে তাকাইয়া রহিল। মোক্ষদা বলিতে লাগিল, না হয় চাকরি করবে। কত মেয়েই তো করছে আজকাল। লেখাপড়া শিখেছ। সুধা জবাব দিল না। মোক্ষদা মুচকি হাসিয়া কহিল, তাও যদি না কর তো এই মুকী বোষ্টমীর ওপর সব ভার ছেড়ে দিও দিদিমণি। যদি দু মাসের মধ্যে তোমাকে রাজরাণী বানিয়ে না তুলতে পারি তো, আমার নামে কুকুর পুষো তুমি।

দুই ভ্রূ কুঁচকাইয়া সন্দিগ্ধ স্বরে কহিল, কি?

মোক্ষদা কহিল, রাজরাণী গো দিদিমণি! ইস্ত্রী তো পায়ের দাসী। মাথার মণি ক'রে রেখে দেবে বলছে—বাড়ি ক'রে দেবে, কাপড়-গয়না যত চাই দেবে—

গূঢ় ক্রোধের সহিত ধারালো কণ্ঠে সুধা কহিল, আমার জন্যে তোমার যে ঘুম নেই মোক্ষদা! এর মধ্যে খদ্দেরও যোগাড় করেছ! তা খদ্দেরটি কে, শুনি?

মোক্ষদা মুখ ও চোখ ঘুরাইয়া কহিল, দিদিমণির যেমন কথা!

খদ্দের কি গো? নাগর। বরের চেয়ে বেশি। কার্ত্তিকের মত চেহারা, দাদাবাবু তার পায়ের নখের যুগ্যিও নয়। পাঁচ-পাঁচখানা বাড়ি শহরে, অঢেল পয়সা। নেকাপড়া-জানা লোক, দু-দুটো পাস। স্ত্রীটা সুন্দরী হ'লে কি হবে, একেবারে গো-মুখ্যু, সোনার-বেনের মেয়ে কিনা। বাবুটির পাস-করা মেয়ের ভারি শখ। সেদিন এসে নিজের চোখে তোমাকে দেখে গেছে, আর সব শুনেছেও—

সুধা বাধা দিয়া কহিল, ওঃ, তাই নাকি? তুমিই শুনিয়েছ বুঝি?

মোক্ষদা গালে হাত দিয়া কহিল, ও কি কথা দিদিমণি! আমি ও কথা বলতে পারি কাউকে? ছি ছি, নির্দ্দোষীকে এমন ক'রে—

সুধা ধমক দিয়া কহিল, চুপ কর। তুমি সাংঘাতিক মেয়েমানুষ। সব করতে পার তুমি। তোমার যা কিছু পাওনা আছে, নিয়ে আজই আমার বাড়ি থেকে চ'লে যেও তুমি।

কান্না যেন মোক্ষদার ঠোঁটের ওপাশেই অপেক্ষা করিতেছিল, ভেউভেউ শব্দে বাহির হইয়া আসিল। চোখে অঞ্চল দিয়া অশ্রু-বিকল স্বরে মোক্ষদা গড়গড় করিয়া যাহা বলিল, তাহার ভাবার্থ এই যে, সে যাহা করিয়াছে, তাহা সুধার ভালর জন্যই। তারপর এক মুহূর্ত্তে অশ্রু-সংবরণ করিয়া কলহের স্বরে কহিল, আমি না হয় চ'লেই যাচ্ছি, কিন্তু কেলেঙ্কারি ঢাকবে কি ক'রে শুনি? ওই পাপ নিয়ে যাবে কোন্ চুলোয়?

সুধা তীব্র চাপা স্বরে কহিল, সেজন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না, তুমি যাও। কিন্তু মোক্ষদাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া দরজার দিকে হাত বাড়াইয়া তীব্রতর কণ্ঠে কহিল, যাও, যাও বলছি।

মোক্ষদা সুধার দিকে একবার অগ্নি-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

পরদিন সকালে বিশুকে ডাকিয়া সুধা কহিল, বিশুদা, সারাদিন কোথায় ক? একবারও তোমার টিকিটি পর্য্যন্ত দেখতে পাবার জো নেই!

বিশু প্রতিবাদের স্বরে কহিল, বাঃ রে! সারাদিনই তো বাড়িতে াকি।

সুধা অভিমানের স্বরে কহিল, একবারও খোঁজ নাও না, আমি রেছি, না বেঁচে আছি! বাবা নেই, তুমি ছাড়া আমার আর কে াপনার আছে, বল?

বিশু কাঁচুমাচু মুখে কহিল, খোঁজ নিই তো মোক্ষদার কাছে।

সুধা সক্ষোভে কহিল, আর খোঁজ নেওয়া! কাল থেকে জ্বর হয়েছে, কবারও জিজ্ঞেস করেছ, কেমন আছি?

বিশু অপ্রতিভ মুখে কহিল, জ্বর হয়েছে নাকি? কই, বুড়ী মাগী তো চছু বলে নি আমাকে! সদম্ভে কহিল, দাঁড়াও, দেখাচ্ছি তাকে।— লিয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিতেই সুধা কহিল, কোথায় পাবে তাকে? া তো নেই, তাকে ছাড়িয়ে দিয়েছি আমি।

বিশু বিস্ময়ের সহিত কহিল, তাই নাকি? কেন?

সুধা গম্ভীর স্বরে কহিল, ঝি রাখবার পয়সা নেই আমাদের। ঠাকুরও াড়িয়ে দিতে হবে। তা ছাড়া এ বাড়িও ছেড়ে দিতে হবে, বাড়িওয়ালা াটিস দিয়েছে। তোমার তো কোন ভাবনা-চিন্তা নেই, ব'সে ব'সে কবল গাঁজা খাচ্ছ আর ঝিমুচ্ছ!

বিশু লজ্জিত মুখে কহিল, ঝিমুই না তো। কি করতে হবে, বল?

সুধা কহিল, করতে হবে অনেক কিছু, কিন্তু তা পরে করলেও চলবে। প্রতি আমার জন্যে একটু ওষুধ এনে দাও দেখি, আর বুকের বেদনার ন্যে একটা মালিশ। যন্ত্রণার ভঙ্গীতে কহিল, সারা বুকটা যেন আড়ষ্ট য়ে আছে, নিশ্বাস নিতে পর্য্যন্ত পারছি না।

বিশু ভয়ে ভয়ে কহিল, হোমিওপ্যাথী ওষুধ—

সুধা বিরক্তভাবে কহিল, ওতে কিছু হবে না বিশুদা। যা বল্‌ছি তাই এনে দাও। ডাক্তারকে বুঝিয়ে বলবে, বুকের অসহ্য বেদনা, যেন ভাল দেখে একটা মালিশ দেন।—বলিয়া ডাক্তারের ফী ও ঔষধের দাম দিয়া তাহাকে বিদায় করিল।

* * *

অগ্রহায়ণের এক শুভলগ্নে মাধুরীর সহিত মনোজের বিবাহ হইয়া গেল। জোড়ে শ্বশুর-বাড়ি ফিরিয়া আসার দিন দুই পরে একদিন শয়ন-কক্ষে বসিয়া মনোজ খবরের কাগজ পড়িতেছিল। হঠাৎ একটা খবরের দিকে চাহিবামাত্র চোখ যেন আটকাইয়া গেল। খবরটা এই :—কলিকাতার—স্ট্রীটের জনৈকা সপ্তদশ বৎসর বয়স্কা অবিবাহিতা তরুণী নাম—সুধানলিনী বোস, মালিশ সেবন করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। দেহ-পরীক্ষায় জানা গিয়াছে, মেয়েটি অন্তঃসত্ত্বা ছিল, ইত্যাদি ইত্যাদি।

দেখিতে দেখিতে মনোজের চক্ষের সম্মুখে দিনের আলো নিবিয়া গিয়া সন্ধ্যার তরল অন্ধকার নামিল, এবং সেই অন্ধকারকে মথিত করিয়া একটি নারীকণ্ঠের ক্লান্ত ও করুণ স্বর বাজিতে লাগিল, বেশি দেরি ক'রো না, বুঝলে? শিগগির ফিরে এস।

হঠাৎ কাহার কোমল স্পর্শে ফিরিয়া চাহিয়া মনোজ দেখিল মাধুরী রূপ ও যৌবনের ঝলকে সর্ব্বাঙ্গ ঝলমল করিতেছে, সৌভাগ্যের আনন্দ যেন মুখে চোখে ধরিতে চাহিতেছে না। মাধুরী হাসিয়া মনোজের গায়ে ঢলিয়া পড়িয়া আবদারের সুরে কহিল, কি পড়ছ গো?

কিছু না।—বলিয়া মনোজ খবরের কাগজটা হাত দিয়া সরাইয়া মাধুরীকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিল।